জৈববিবর্তনবাদ

দেড়শ' বছরের দ্বন্দ্ব বিরোধ

Neb

মনিরুল ইসলাম

জৈববিবর্তনবাদ

দেড়শ' বছরের দ্বন্দ্ব বিরোধ

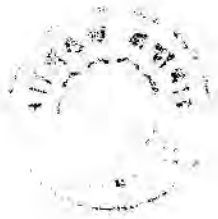

২০৭৪.৩
১৪।২।০৮

সংহতি
১৪১৪

জৈববিবর্তনবাদ
দেড়শ' বছরের দ্বন্দ্ব বিরোধ
প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ ১৪১৪ এপ্রিল ২০০৭
স্বত্ব : লেখক

প্রকাশক
সংহতি প্রকাশন
১২০ আজিজ সুপার মার্কেট
নিচতলা, শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
অমল আকাশ

অক্ষর বিন্যাস
সাজিদ তৌহিদ

মুদ্রণ
রিকো প্রিন্টার্স, ৯ নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

দাম
একশত টাকা বিদেশে ৫ ডলার

JOIBOBIBORTONBAD: DERSHAW BOCHORER DONDO BIRODH By Monirul Islam. © Writer. Published by Samhati Prokashan, 120 Aziz Super Market (GF), Shahbag, Dhaka-1000. e-mail : samhatiprokashan@yahoo.com
Cover Design : Amal Akash. Price Tk. 100.00 US $ 5.00.

ISBN 984-70046-0001-7

উৎসর্গ

আমার মাকে

শত প্রতিকূলতার মধ্যেও যিনি আমার
সৃজনশীলতাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন

এবং

বাবাকে

যিনি প্রথম শিল্প-সাহিত্যের বীজ বুনেছিলেন আমার হৃদয়ে

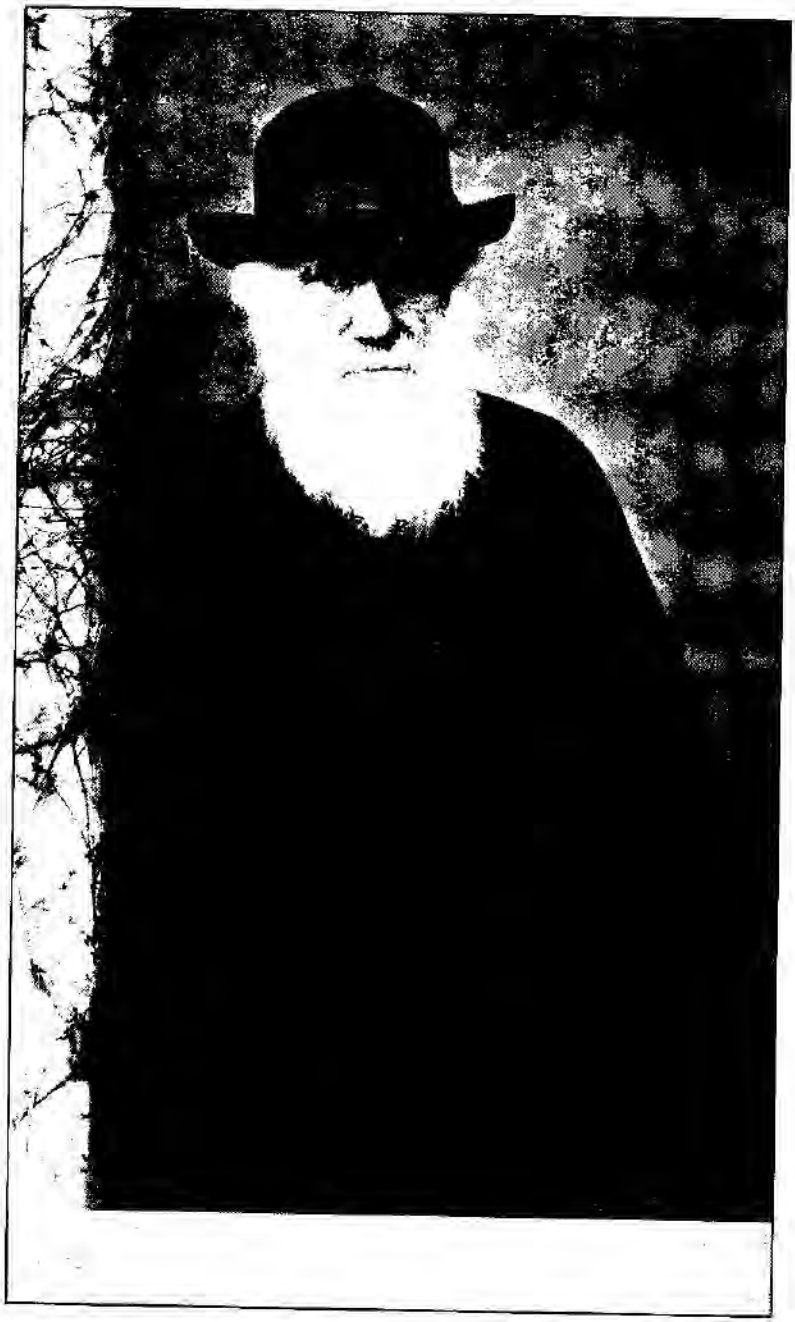

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ৯

ভূমিকা ১১

বিরোধিতার সূচনা: আলোড়ন, আবেগ ও উৎকণ্ঠা ১৩

কাঠগড়ায় বিজ্ঞানের শিক্ষক এবং জৈববিবর্তনবিরোধী আইন ২২

বিশ্বাস রক্ষার সংগ্রাম এবং নানান 'বৈজ্ঞানিক' কৌশল ২৫

দার্শনিক দোদুল্যমানতা এবং "ওয়ালেস সমস্যা" ৩১

জৈববিবর্তন তত্ত্বের অপব্যাখ্যা এবং অপব্যবহার ৩৬

জৈববিবর্তন নিয়ে যৌক্তিক বিতর্ক ৪৭

জৈববিবর্তন পাঠের দার্শনিক প্রস্তুতি ৬১

জৈববিবর্তনের তত্ত্ব গ্রহণের দার্শনিক ও পদ্ধতিগত সংকট প্রসঙ্গে

মুখবন্ধ

জীবজগত এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোর উৎপত্তি এবং বিকাশ সম্পর্কে মানুষের যে সকল মৌলিক প্রশ্ন এবং অনুসন্ধিৎসা রয়েছে তা মেটানোর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যে শাখাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সফল সেটি হচ্ছে জৈববিবর্তনবাদ বা বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞান। শুধু তাই নয়, জৈব বিবর্তনের তত্ত্বই জীববিজ্ঞানের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা (সময়ের সাথে সাথে জীবের বংশগতির পরিবর্তন) সম্পর্কে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। তাই অনেক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে জৈব বিবর্তনের ব্যাখ্যা ছাড়া পরিপূর্ণভাবে বোঝা যায় না। আধুনিক প্রায়োগিক জীববিজ্ঞানসমূহের (applied biological sciences) বহু প্রশ্নের সমাধান করা হয়েছে জৈববিবর্তনের তত্ত্বের ভিত্তিতে। এ কারণেই বিখ্যাত বংশগতি বিজ্ঞানী ডবঝনস্কি বলেছিলেন—"Nothing in Biology senses without the light of Evolution." (জীববিজ্ঞানে কোনো কিছুই অর্থবহ হয় না জৈব বিবর্তনের আলো ছাড়া)। অথচ আমাদের দেশে উচ্চ-শিক্ষিত, এমনকি মুক্তচিন্তার ধারক অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যেই জৈববিবর্তন সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। এদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা বিবর্তন একটি বিতর্কিত (Controversial) বিষয় যা এখনো বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

জৈববিবর্তনের তত্ত্ব আমাদের দেশে সবচেয়ে অপঠিত একটি বিষয়। যাঁরা অল্পবিস্তর এ বিষয়ে পড়েছেন তাঁদের অধিকাংশেরই এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা নেই। এমনকি জৈববিজ্ঞান সমূহের উচ্চতর পর্যায়ের পাঠ্যক্রমেও এ বিষয়ে কোনো নিয়মিত চর্চা হয় না। এ রকম একটি পরিস্থিতিতে অধিকাংশ মানুষই অপেশাদার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধ-যুক্তি এবং অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এই বইটি জৈববিবর্তনের মূল বিষয় সম্পর্কিত নয়। বরং বিজ্ঞানের এই প্রয়োজনীয় শাখার বিরোধিতার স্বরূপ উন্মোচন এবং এই তত্ত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সংকট রয়েছে তার বিভিন্ন দিককে তুলে ধরাই এই বইয়ের মূল লক্ষ্য। এ আলোচনা জৈববিবর্তন সম্পর্কিত বিভ্রান্তি কিছুটা দূর করতে পারলেও এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

গত শতকের সত্তর ও আশির দশকে মৌলবাদী গোষ্ঠী পশ্চিমা দেশগুলোতে 'যৌক্তিকভাবে' জৈববিবর্তনের বিরোধিতায় বেশ তৎপর হয়ে ওঠে। তাঁরা এ সময় বেশ কিছু বিবর্তনবাদ-বিরোধী বইও প্রকাশ করেছিলেন। তাদের দেখাদেখি এ দেশেও মৌলবাদীরা ঐ সব বইয়ের অনুসৃতি প্রকাশ করতে থাকে। বিষয়টি এ দেশের প্রগতিশীল ও মুক্তচিন্তার অনুসারীদেরও দৃষ্টি কেড়েছিল।

আশির দশকে, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন বাঙলাদেশ লেখক শিবিরের

সাধারণ সম্পাদক আবু মুহাম্মদ, মৌলানা রহীম রচিত 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব' নামের বইটি আমাকে দেন এর একটি উপযুক্ত সমালোচনা লেখার জন্য। এ কাজটি করতে গিয়ে আমি জৈববিবর্তন এবং এ সংক্রান্ত বিতর্কগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের চেষ্টা করি। নব্বই এর দশকে এ দেশের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাক্রম থেকে জৈববিবর্তনকে বাদ দেবার পর এ বিষয়ে অস্পষ্টতা এবং বিভ্রান্তি দূর করার জোর তাগিদ অনুভব করি। এ সময়ে লেখক শিবিরের পত্রিকা তৃণমূল-এ প্রকাশিত 'বিজ্ঞানের মৌলবাদী ব্যবহার' প্রবন্ধে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করি। এ বিষয়ে সম্যক ধারণার জন্য ঐ আলোচনা যথেষ্ট ছিল না। তাই প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অনেকেই এ বিষয়ে আরো বিস্তৃতভাবে লিখতে অনুরোধ করেন। বর্তমান প্রবন্ধগুলি পরবর্তীকালে *নতুন পাঠ* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক আবু মুহাম্মদ, জোনায়েদ সাকি, তাসলিমা আখতার, ফিরোজ আহমেদ এবং পাঠকদের অনেকের অব্যাহত তাগিদ ও চাপ ছাড়া আমার মতো অপোছালো মানুষের বই আলোর মুখ দেখত না। বইটি প্রকাশের জন্য সংহতি প্রকাশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঢাকা
ফেব্রুয়ারি, ২০০৭

মনিরুল ইসলাম

ভূমিকা

বিজ্ঞানের ইতিহাসে যেসব নতুন আবিষ্কারকে পুরনো ধারণা, মৌলবাদী গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্রীয় বিরোধিতার শিকার হতে হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জৈববিবর্তন তত্ত্বের বিরোধিতা। এই বিরোধিতা এত ব্যাপক, বহুমুখী ও সুদীর্ঘ সময় ধরে চলে আসছে, যা ইতিহাসে নজিরবিহীন। একে একমাত্র তুলনা করা চলে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বের মতবাদের সাথে। কিন্তু কোপার্নিকাস এবং গ্যালিলিওর মতবাদের বিরোধিতা অত্যন্ত তীব্র ও নিষ্ঠুর হলেও তা ছিল মূলত চার্চ এবং রাষ্ট্রের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। মৌলবাদী মূঢ়তার বাইরে জনসাধারণ বা বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে কোনো উল্লেখযোগ্য যৌক্তিক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে। অবশ্য একথাও ঠিক যে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর সমাজ বাস্তবতায় কোনো একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে ১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইনের বিখ্যাত গ্রন্থ *অরিজিন অব স্পেসিস* প্রকাশিত হবার পর অদ্যাবধি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংগঠিত বা অসংগঠিতভাবে এর বহু ধরনের বিরোধিতা, অপব্যাখ্যা, অপব্যবহার পৃথিবীব্যাপী চলে আসছে। মৌলবাদী ও অযৌক্তিক বিরোধিতার পাশাপাশি অনেক যৌক্তিক বিরোধিতা এবং পদ্ধতিগত বিতর্কের ব্যাপকতাও কম নয়। জীবজগতের একটি সাধারণ প্রবণতা হিসেবে জীববিজ্ঞানীদের দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে গৃহীত হবার পরও এই ব্যাপক বিরোধিতা দেখে অনুমান করা যায় যে, এই তত্ত্ব সম্পর্কে একদিকে যেমন রয়েছে অস্পষ্ট ও ভ্রান্তধারণা অন্যদিকে এ যুগেও বহু মানুষ এই তত্ত্বের ব্যাখ্যাগুলো গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত নন।

এই সুদীর্ঘ ও ব্যাপক বিরোধিতার মধ্য দিয়ে বিবর্তনের তত্ত্ব সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা হয়েছে। প্রকাশ পেয়েছে মৌলবাদী ও পশ্চাৎপদ চেতনার স্বরূপ ও কর্মপদ্ধতি। এই বিরোধিতা ও বিতর্কগুলোকে জানা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে জৈববিবর্তনবাদ এবং এ যুগের মানুষের চিন্তার ওপর এই তত্ত্বের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াকে উপলব্ধি করা সম্ভব। দীর্ঘ দেড়শ' বছরব্যাপী চলে আসা উল্লেখযোগ্য বিরোধিতাগুলোকে তুলে ধরা এবং এসবের যৌক্তিকতা ও প্রভাবকে উপলব্ধি করা এ যুগের মানুষের মুক্তচিন্তা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় একটি দিক।

দেড়শ' বছর আগে বিবর্তনের বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্বের প্রথম অবতারণা যেমন ঐতিহাসিকভাবে সমাজ ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারাবাহিকতার সাথে সম্পর্কিত, তেমনি এ কথাও সত্যি যে বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞানও ১৮৫৯ সালের অবস্থান থেকে

অনেকটা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে গেছে এবং সমৃদ্ধ ও স্পষ্টতর হয়েছে। জৈববিবর্তন নিয়ে দ্বন্দ্ব বিরোধকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে এ বিষয়টাকে অবশ্যই বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে।

বিরোধিতার ধরনসমূহ

জৈববিবর্তনের যেসব বিরোধিতা ও দ্বন্দ্ব বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত হয়েছে তার মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে ধর্ম, ধর্মীয় গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান এবং মৌলবাদী বিরোধিতা। অন্যদিকে এ তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতাকে উপস্থাপন করার মাধ্যমে যৌক্তিক (rational) বিরোধিতারও একটা ধারা রয়েছে। এই দুই বিরোধিতার মাঝামাঝি রয়েছেন সমন্বয়বাদীরা, যারা জৈববিবর্তনকে গ্রহণ করেছেন ধর্মীয় ধারণার সাথে মিলিয়ে অনেকে একে বর্জন করেছেন কিছুটা ভুল বুঝে এবং কিছুটা আবেগে; এদের মতে বিবর্তনবাদ 'হৃদয়' বা 'মন'কে অস্বীকার করে। অন্য এক ধরনের প্রবণতা হচ্ছে এর সুবিধাবাদী ও বিকৃত ব্যাখ্যা করা, যা সমন্বয়বাদীদের মধ্যেও কিছুটা রয়েছে; কিন্তু সুবিধাবাদী ব্যাখ্যাকারীরা ইতিহাসে পৃথকভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে, কারণ এরা তাদের জৈব-নির্ধারণবাদী ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিষ্ঠুরতম বর্ণবাদের জন্ম দিয়েছিল। অপর এক ধরনের বিতর্ক হচ্ছে পদ্ধতিগত বিতর্ক। এখানে জৈববিবর্তনের বিরোধিতা নেই, কিন্তু কিভাবে তা ঘটেছে তা নিয়ে রয়েছে বিভিন্ন মতবাদের জোর দ্বন্দ্ব বিরোধ।

জৈববিবর্তনের এসব বিরোধিতার ঐতিহাসিক, সামাজিক ও মানসিক মাত্রাকে বুঝতে না পারলে এসব বিরোধিতার গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের আলোচনায় বিরোধিতার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এসব মাত্রাকে যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্যই অনেক প্রাসঙ্গিক ঘটনা ও আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে।

বিরোধিতার সূচনা: আলোড়ন, আবেগ ও উৎকণ্ঠা

প্রথম আলোড়ন: ঐতিহাসিক অক্সফোর্ড বিতর্ক

চার্লস ডারউইনের বিখ্যাত গ্রন্থ *অরিজিন অব স্পেসিস*-এর প্রথম সংস্করণের ১২৫০ কপি প্রকাশিত হবার পরপরই বিক্রি হয়ে যায়। এই গ্রন্থটি যে তত্ত্বের অবতারণা করেছিল তা নিয়ে ইংল্যান্ডে প্রথম ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বইটি প্রকাশিত হবার ৭ মাস পরে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ১৮৬০ সালের জুন মাসে অক্সফোর্ডে তাদের সম্মেলনের সময় এ বিষয়ের ওপর একটি পর্যালোচনা সভার আয়োজন করে। এই পর্যালোচনা সভাটিই পরিণত হয় এক চাঞ্চল্যকর, উত্তপ্ত ও উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্কে এবং এই বিতর্কই পরবর্তীতে 'ঐতিহাসিক অক্সফোর্ড বিতর্ক' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এই বিতর্কে ডারউইনের বিবর্তনবাদের বিরোধী ছিলেন জীববিজ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অক্সফোর্ডের বিশপ স্যামুয়েল উইলবারফোর্স এবং ডারউইনের পক্ষে দাঁড়ান বিখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানী এবং ডারউইনের সুহৃদ থমাস হেনরি হাক্সলি। উইলবারফোর্সের আক্রমণাত্মক কথার ফলেই উত্তপ্ত বিতর্কের সূত্রপাত হয়। বলাবাহুল্য তার বিতর্কে আবেগ ও উপহাসের প্রাচুর্য থাকলেও কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছিল না। তিনি হাক্সলিকে উপহাস করে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁর মাতৃকুল না পিতৃকুল নরবানর (ape) ছিল। এতে হাক্সলি নিজের বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, বিজ্ঞানের স্বার্থেই তিনি বিতর্কে অংশগ্রহণ করছেন এবং বিশপের উপহাসের জবাবে বলেন, "আমি বানরের বংশধর হতে লজ্জাবোধ করি না কিন্তু একজন সত্যের অপলাপকারীর সাথে সম্পর্কিত হতে লজ্জাবোধ করি।" সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার পরিস্থিতি চরম উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে পড়ে। উপস্থিত একজন মহিলা চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং নাটকীয়ভাবে ডারউইনের সমুদ্র অভিযানের জাহাজ 'বিগল'-এর অধিনায়ক ক্যাপ্টেন ফিটজরয় (fitzroy) হলের পেছনের দিকে উঠে দাঁড়িয়ে হাতে একটি বাইবেল উঁচিয়ে নাড়তে থাকেন। এদিকে এই ঘটনা বিকৃত হয়ে রটে যায় যে হাক্সলি বলেছেন যে, তিনি বিশপ হবার চেয়ে বানর হতেই পছন্দ করবেন। সেদিন থেকেই হাক্সলি ডারউইনের প্রধান যোদ্ধায় পরিণত হন এবং তাঁকে বলা হতো ডারউইনের বুলডগ। এই বিতর্কে হাক্সলি বিশপকে পাল্টা উপহাসে নাস্তানাবুদ করলেও এই বিতর্ক সাধারণ মানুষের মনে জৈববিবর্তনবাদ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা বা বিবর্তনবাদের প্রতি কোনো যৌক্তিক সমর্থন সৃষ্টি করতে পারেনি। এ ধরনের আবেগ ও উপহাসের দ্বন্দ্ব মানুষের মনে কোনো

যৌক্তিক ধারণা সৃষ্টি করতে পারে না বরং এ ধরনের আলোচনা থেকে সাধারণ মানুষ তাদের পূর্বনির্ধারিত ধারণার বশবর্তী হয়েই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

এই বিতর্কের প্রতিক্রিয়া থেকে অনুমান করা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীতে অধিকাংশ মানুষই মানসিকভাবে এ তত্ত্ব গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। অধিকাংশ বিজ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তিরাও এ রকম একটি তত্ত্বকে মেনে নিতে পারেননি। এর কারণ দুটি। নিউটন এবং তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল ঈশ্বর পৃথিবীকে বহু বছর পূর্বে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, এটি বর্তমানেও সেভাবেই আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই এই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করতে থাকেন বিজ্ঞানীরা। ভূ-তাত্ত্বিক জেমস হাটন ও পরবর্তীতে চার্লস লায়েল পৃথিবীর পরিবর্তনশীলতার প্রমাণ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন, যা বাইবেলে বর্ণিত পৃথিবী সৃষ্টির ধারণার পরিপন্থী ছিল। যদিও উনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রচেষ্টা ছিল কিন্তু এ কথাও ঠিক যে এ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করতেন বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হলো ঈশ্বরের সৃষ্টির রহস্য খুঁজে বের করা। বিবর্তনবাদ এই ধারণাকে আঘাত করে। এর চেয়েও গভীর আঘাত সে হেনেছিল মানুষ ও তার নৈতিক বোধের বিকাশকে জড় জগতের বিকাশের সাথে একীভূত করার ফলে। মানুষ, বস্তুজগত ও ইতর প্রাণী একই পদবাচ্য এই ধারণা উনবিংশ শতাব্দীর বহু যৌক্তিক মানুষের দীর্ঘদিনের লালিত আবেগকে আহত করেছিল। অক্সফোর্ড বিতর্কে এই মাঝামাঝি পর্যায়ের যৌক্তিক মানুষেরা ছিলেন না। তাঁরা পরবর্তীতে অন্যভাবে তাদের বিতর্ক ও বিরোধিতাকে উপস্থাপন করেন, এ সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করবো। এই বিতর্কের দুই পক্ষ তৎকালীন ইংল্যান্ডের চরম দুই অংশের প্রতিনিধি। উইলবারফোর্স মৌলবাদী পুরনো পশ্চাৎপদ ধারণার প্রতিনিধি অন্যদিকে হাক্সলি ছিলেন সেই বিকাশমান ধারার প্রতিনিধি, যাঁরা অতিপ্রাকৃত কোনো ঘটনায় বিশ্বাস করতেন না এবং বিশ্বাস করতেন জ্ঞান কেবল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই অর্জন করা যায়। এই বিতর্কে হাক্সলির সদর্প উপস্থিতি প্রতীকীভাবে ভবিষ্যতে এই শেষোক্ত ধারার বিকাশের সম্ভাবনাকেই যেন মূর্ত করে তুলেছে। অক্সফোর্ড বিতর্ক সম্পর্কে হাক্সলি তার বন্ধু বিজ্ঞানী জোসেফ প্রিস্টলিকে লেখেন, "কিছু লোক আছে যাদের কাছে, মানুষের মনে বদ্ধমূল পুরনো ভ্রান্ত ধারণাকে উপড়ে ফেলার সন্তুষ্টি নতুন সত্য আবিষ্কার করার মতোই গুরুত্বপূর্ণ... এবং যারা শুধুমাত্র জ্ঞানের বিকাশ ঘটানোর চেয়ে চিন্তার স্বাধীনতা অর্জন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।" অক্সফোর্ড বিতর্কের যত সীমাবদ্ধতাই থাক, এই আলোড়ন যে উনবিংশ শতাব্দীর মুক্তচিন্তা বিকাশের পথে একটি মাইলস্টোন, হাক্সলির এই উক্তি থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আদমের নাভী ও নূহ্-এর প্লাবন এবং সৃষ্টিতত্ত্বের পক্ষে দুই প্রকৃতিবিজ্ঞানী

পৃথিবী ও মানব জাতির সৃষ্টি সম্পর্কে ধর্মীয় ধারণাকে উনবিংশ শতাব্দীতে বিবর্তনবাদ ভীষণভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ইউরোপের ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রথমে কিঞ্চিত স্থূলভাবে মারমুখী হলেও পরে যুক্তির মাধ্যমে এগুতে শুরু করে। তখন থেকেই বিবর্তনবাদকে বিরোধিতা করতে গিয়ে পাল্টা মতবাদ হিসেবে ধর্মে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বকে

প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলে আসছে। জেনেসিস হলো *ওল্ড টেস্টামেন্ট*-এ বর্ণিত সৃষ্টির সেই কাহিনী, যা খ্রিস্টান, মুসলিম ও ইহুদিসহ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের ধর্মবিশ্বাসের অংশ। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সকল বিশ্বাস ছিল সকলের কাছেই প্রশ্নাতীত। কিন্তু এই শতাব্দীতে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এসব বিশ্বাস সম্পর্কে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। তখন এর পক্ষে যুক্তি প্রদান এবং একে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করার বহু ধরনের চেষ্টা শুরু হয়। এসব চেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও ভূতত্ত্ববিদরা ধর্মগ্রন্থকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য বই লিখতে থাকেন।

সৃষ্টিতত্ত্বে বলা হয়েছে, খ্রিস্টপূর্ব ৪ হাজার বছর আগে ঈশ্বর ছয় দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। প্রথম মানব আদম ও হাওয়া মাতৃগর্ভে জন্মাননি, তাদের স্বর্গ থেকে তৈরি করে মর্ত্যে পাঠানো হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলে সৃষ্টিতত্ত্বের এসব বিষয় নিয়ে অনেক প্রশ্নের অবতারণা হলো। যেমন, ঈশ্বর যদি সব প্রাণী সৃষ্টি করে মর্ত্যে পাঠাবেন তাহলে পৃথিবীতে প্রাচীনকালের বিভিন্ন জীবের যেসব ফসিল পাওয়া গেছে (যারা অধিকাংশই এখন লুপ্ত), সেগুলো কিসের আলামত?

ফিলিপ গোস নামে ঊনবিংশ শতাব্দীর এক প্রকৃতিবিদ চার্লস ডারউইনের সাথে পাখি, কীট এবং সামুদ্রিক প্রাণী সম্পর্কে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য সমৃদ্ধ চিঠিপত্র আদান প্রদান করেছিলেন। ১৮৫৭ সালে গোস *ওমফেলাস* (গ্রিক ভাষায় নাভী) নামে সৃষ্টিতত্ত্বের পক্ষে এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই বইয়ে তিনি দাবি করেন আদমের নাভীর মতো এই ফসিলগুলো হচ্ছে এক ধরনের 'প্রাকৃতিক জন্মের নির্দশন যা কখনো ঘটেনি'। স্তন্যপায়ী প্রাণীর বাচ্চা যখন মায়ের গর্ভে বড় হয় তখন নাভী থেকে সম্প্রসারিত Umbilical Cord দিয়ে তার (গর্ভস্থ শিশুর) দেহ প্ল্যাসেন্টা বা অমরার সাথে যুক্ত থাকে। জেনেসিস অনুযায়ী আদম মাতৃগর্ভে ছিল না, কিন্তু তার শরীরে নাভী ছিল যা "কোনো কিছুর নির্দশন নয়"। ফিলিপ গোসের মতে, পৃথিবীর এসব ব্যাপক সংখ্যক ফসিল আদমের নাভীর মতোই গুরুত্বহীন। অর্থাৎ গোস যা বলতে চান সংক্ষেপে তা হচ্ছে, ঈশ্বর ভূতাত্ত্বিকদেরকে বোকা বানানোর জন্য এসব ফসিল পুঁতে রেখেছেন। একজন প্রকৃতিবিদ হয়েও ফিলিপ গোস যে মাত্রার কাণ্ডজ্ঞানহীনতা দেখিয়েছিলেন তাকে পরবর্তীকালেও কেউ অতিক্রম করতে পারেননি। গোসের এই মতামত সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী এবং ধর্মযাজকসহ সকল যৌক্তিক মানুষকে বিস্মিত ও বিহ্বল করেছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ধর্মযাজক চার্লস কিংসলি'র (Reverend Charles Kingsley) প্রতিক্রিয়া। তিনি বলেন, "ধর্মগ্রন্থকে রক্ষা করার জন্য যদি এভাবে সত্য ও কাণ্ডজ্ঞানকে পদদলিত করতে হয়, তাহলে আমি অবশ্যই ধর্মগ্রন্থকে ত্যাগ করে কাণ্ডজ্ঞানের পাশেই দাঁড়াতে চাই।"

অনেক যৌক্তিক ধর্মযাজকও বিবর্তনবাদের এই মূঢ় বিরোধিতা মেনে নিতে পারেননি। ফিলিপ গোসের বই প্রকাশের প্রায় দেড়শ' বছর পরও এ ধরনের যুক্তির অবতারণা করে বিবর্তনবাদের বিরোধিতার নিদর্শন কম নয়, আমাদের আশপাশেই রয়েছে। তবে এই সব বই কোনো প্রকৃতিবিজ্ঞানীর রচনা নয়, এটাই কিছুটা স্বস্তিকর।

নূহ-এর প্লাবন নিয়েও এ ধরনের বিতর্ক সৃষ্টি হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন মানুষের আবিষ্কৃত প্রজাতির সংখ্যা বাড়তে থাকলো এবং ১,০০০ জাতের স্তন্যপায়ী,

৬,০০০ জাতের পাখি এবং ১,৫০০ জাতের সরীসৃপ, উভচর এবং অসংখ্য পোকামাকড়ের প্রজাতি আবিষ্কৃত হলো. তখন প্রশ্ন দেখা দিল এতগুলো জাতের এক জোড়া করে প্রাণী কি করে ৩০০ কিউবিট (১ কিউবিট = ১.৫ ফুট) লম্বা এবং ৫০ কিউবিট চওড়া জাহাজে ৬ সপ্তাহের খাবারসহ স্থান পেল এছাড়া হাজার হাজার উদ্ভিদ প্রজাতি তো রয়েছেই।

ইংল্যান্ডের ক্রিস্টাল প্যালেসের যে Zoological Garden রয়েছে তার ৭ ভাগের এক ভাগ স্থান ছিল নূহ-এর জাহাজে। জীববিজ্ঞান সম্পর্কে পড়াশোনা না থাকলেও যে কোনো কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ বুঝতে পারবেন ঐ জাহাজে সকল প্রজাতিকে স্থান দেয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার। উনবিংশ শতাব্দীতে এ নিয়ে ধর্মের মধ্যেই অনেক বিতর্ক হয়, তবে ১৮৫০-এর দশকের মধ্যেই অধিকাংশ বাস্তববাদী চিন্তাবিদগণ একমত হন যে নূহ-এর প্লাবন পৃথিবীব্যাপী কোনো ঘটনা ছিল না।

উনবিংশ শতাব্দীতে অন্য এক পেশাদার ভূতত্ত্ববিদ শক্ত হাতে ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বের পক্ষে এবং বিবর্তনবাদের বিপক্ষে কলমযুদ্ধ শুরু করেন। তার নাম হ্যুগ মিলার। মিলার ভূতত্ত্বের গবেষণায় ছিলেন পরিশ্রমী এবং ১৮৪১ সালে *The Old Red Sand Stone* (প্রাচীন লাল বেলে পাথর), ১৮৪৯ সালে *Foot Prints of Creator* (স্রষ্টার পদচিহ্ন) এবং ১৮৬৮ সালে *Testimony of Rocks* (পাথরের সাক্ষ্য) নামে তাঁর তিনটি বই প্রকাশিত হয়। ওই শতাব্দীতে প্রকৃতিবিজ্ঞান ও ভূতত্ত্ব যেভাবে বিভিন্ন নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে অগ্রসর হচ্ছিল তা ধর্মীয় বিভিন্ন ধারণার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যতদিন যাচ্ছিল পাথরের ইতিহাসে পৃথিবীর বয়স বেড়েই যাচ্ছিল এবং সৃষ্টিতত্ত্বের উল্লিখিত বয়সের সাথে তার সঙ্গতিও থাকছিল না যদিও ওই শতাব্দীর অধিকাংশ ভূতত্ত্ববিদ ধর্মের অনুসারী ছিলেন এবং তাদের অনেকে সাধারণ মানুষকে এই বলে অভয় দিয়েছিলেন যে, পাথরের রেকর্ড এবং ঈশ্বরের কথার মধ্যে কোনো 'গরমিল' হবে না, কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে পাথরের স্তরসমূহের ব্যাখ্যা নিয়ে জোর বিতর্ক ছিল। অনেক ধর্মযাজক এ সময় ভূতত্ত্বকে এড়িয়ে চলার উপদেশ দিতেন।

এমন একটি পরিস্থিতিতে হ্যুগ মিলার তাঁর বইয়ের মাধ্যমে দুটো ব্যাপার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। প্রথমত, ভূতত্ত্বের তথ্যাবলি ধর্মবিরোধী নয়; দ্বিতীয়ত, বিবর্তন সম্পর্কিত তত্ত্বগুলো বিজ্ঞানসম্মত নয়। কিন্তু ভূতত্ত্বের প্রতি নিবেদিত থাকায় তার নিজের অবস্থানও টলে যায়। তার প্রথম দিকের বই দু'টিতে তিনি বলেন, এটা সম্ভব যে পৃথিবী ২৪ ঘণ্টার দিন হিসেবে ছয় দিনে সৃষ্ট হয়েছে এবং এর বয়স ছয় হাজার বছরের মতো। কিন্তু ভূতত্ত্বের গবেষণায় সততার সাথে লেগে থাকার ফলে তিনি বুঝতে পারেন পৃথিবীর বয়স আরো বহুগুণ বেশি এবং পাথরের স্তরগুলো এত অল্প সময়ে সৃষ্টি হতে পারে না। তাই তার সর্বশেষ কাজ *পাথরের সাক্ষ্য* (১৮৬৮) গ্রন্থে তিনি বলতে বাধ্য হন— বাইবেলে উল্লিখিত 'দিন' কোটি বছরব্যাপীও হতে পারে শেষ বইটি প্রকাশের অনেক আগেই মিলারের মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দেয় এবং ১৮৫৬ সালেই তিনি আত্মহত্যা করেন। জনগণের মধ্যে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, ফসিলের সাথে ধর্মগ্রন্থকে মেলাতে গিয়েই মিলার তার চিন্তাশক্তি ও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং অনেকে তখন ভূতত্ত্ব চর্চাকেও ভীতির চোখে দেখতে থাকেন।

বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে মিলারের যুক্তি ও প্রমাণ চার্লস ডারউইনের *অরিজিন অব স্পেসিস*-এ উপস্থাপিত বিশাল তথ্য প্রমাণের তুলনায় ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল ও দুর্বল। উনবিংশ শতাব্দীতে বেশ সাড়া জাগালেও হাগ মিলারের বইগুলো এখন কেবল ইতিহাসের অংশ। ফিলিপ গোস ও হাগ মিলারের পরও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবর্তনবাদের বহু প্রতিবাদ হয়েছে কিন্তু আর কোনো প্রকৃতিবিদ, জীববিজ্ঞানী বা ভূতত্ত্বিক বিবর্তনবাদবিরোধী ধর্মীয় ধারণা প্রতিষ্ঠার জন্য এমন সক্রিয় হয়ে ওঠেননি।

'বিবর্তনবাদের খড়্গ' এবং দুই শতাব্দীর দুই সাহিত্যিকের আহত হৃদয়

ভিক্টোরীয় যুগের বিখ্যাত ইংরেজ উপন্যাসিক, বিতার্কিক ও কবি স্যামুয়েল বাটলার চার্লস ডারউইনের মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করে বেশ কয়েকটি বই লেখেন, সেগুলো যথাক্রমে *Life and Habit* (১৮৭৭), *Unconscious Memory* (১৮৮০), *Evolution old and New* (১৮৭৯) এবং *Luck or Cunning* (১৮৮৬)। বাটলার এক সময় চার্লস ডারউইনের ভক্ত ছিলেন, তাদের নিয়মিত যোগাযোগও ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি ডারউইনবিরোধী হয়ে ওঠেন। বাটলার যেমন বিবর্তনের বিরোধী ছিলেন তেমনি তিনি ধর্মীয় অর্থাৎ চার্চের মতেরও বিরোধী ছিলেন।

বাটলার মূলত ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বকে আক্রমণ করেন। প্রাকৃতিক নির্বাচনে যেভাবে বলা হয়েছে যে, জীবের অর্জিত বৈশিষ্ট্যাবলি (acquired characters) সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয় না, তা বাটলার মানতে পারেননি। তার মতে, মানুষ জীবদ্দশায় যা অর্জন করলো তা যদি পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত নাই হবে, তাহলে কোনো প্রগতিই ঘটবে না, কেবল 'অবক্ষয় ও মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন' টিকে থাকবে। বাটলার ডারউইনের তত্ত্বে ভীষণভাবে আহত, বিপন্ন ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। বাটলারের এ অবস্থানকে খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করলে আমরা বুঝতে পারব যে তিনি মানুষের অভিজ্ঞতা, অর্জন, প্রগতি প্রভৃতি বিষয়গুলোকে কেবল জৈব (Biological) প্রপঞ্চ হিসেবে বিবেচনা করে এক ধরনের সরলীকরণ করেছেন এবং মানুষের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বিষয়টিকে বিবেচনার মধ্যেই আনেননি। বরং জৈব বংশগতিকেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে মানুষের অভিজ্ঞতা সঞ্চারের একমাত্র পথ বলে বিবেচনা করেছেন।

তাঁর ক্ষোভ এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে, তিনি ডারউইনের ব্যক্তিগত চরিত্রকে পর্যন্ত আক্রমণ করেছিলেন। বাটলারের এই ক্ষোভ ও অসঙ্গত ব্যবহার ও উক্তি ছিল কিছুটা আপত্তিকর। বিখ্যাত আইরিশ নাট্যকার ও দার্শনিক জর্জ বার্নার্ড শ অবশ্য বাটলারের এই অসঙ্গত আচরণের কিছু যৌক্তিক কারণ ছিল বলে বর্ণনা করেছেন। তার বিবর্তনমূলক নাটক *Back to Methu Salah* বইয়ের ভূমিকায় তিনি লিখেন, "বাটলারের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে, ডারউইন এ জগত থেকে মন বা হৃদয়কে বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি এটাও মনে করতেন এমন কাজ যে করতে পারে সে মনুষ্য পদবাচ্য নয়।" বার্নার্ড শ বাটলারের সাথে অনেক ব্যাপারে একমত ছিলেন এবং এ সম্পর্কে তিনি আরো লেখেন, "জীবন ও আশাকে দুঃখ ও হতাশা থেকে পৃথক করে যে সাগর ডারউইনবাদ তাকে উড়িয়ে দিয়েছিল। পৃথিবী কোনো পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য,

দক্ষতা কিংবা বুদ্ধিবৃত্তি ছাড়া চলতে পারে এই ধারণা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে কলুষিত করেছিল।"

এখানে আরো দু'টি প্রশ্ন উঠেছে, দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক প্রশ্ন। প্রথমত, জীবের বিবর্তনের কথা বলা আর মনকে অস্বীকার করা এক কিনা। বাটলার এবং বার্নার্ড শ-এর দার্শনিক মত অনুযায়ী মন হলো বস্তুনিরপেক্ষ এবং অতিপ্রাকৃত কোনো বিষয়। প্রজাতির উৎপত্তি বা জীবের বিবর্তন প্রকৃতিতে কোনো পরিকল্পনার দ্বারা হয়নি এ কথা বলা তাদের কাছে মনকে অস্বীকার করার নামান্তর ছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী অবশ্য মনকে মস্তিষ্কের কার্যকলাপ বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে, যাকে বস্তুগতভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়।

বাটলার ও বার্নার্ড শ-এর সাথে বিবর্তনবাদের দ্বন্দ্ব প্রকৃতপক্ষে বস্তুবাদ ও ভাববাদের সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব। যদিও ডারউইন তার বিবর্তনবাদের তত্ত্ব উপস্থাপন করতে গিয়ে কোথাও কোনো দার্শনিক সিদ্ধান্ত বা মন্তব্য প্রকাশ করেননি কিন্তু সত্যকে দেখবার ও বিচার করার ক্ষেত্রে তার পদ্ধতি ছিল বস্তুবাদী। বস্তুগত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতেই তার সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রাকৃতিক নির্বাচন যেহেতু সচেতন কোনো প্রক্রিয়া নয় বরং যথেচ্ছ (random) একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা জটিল জৈব প্রপঞ্চকগুলো (জীবের মধ্যে) সৃষ্টি হয়েছে এই সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত; সমস্ত বিশ্বই পরিকল্পনা ছাড়াই তৈরি হতে পারে— পরোক্ষভাবে এই সিদ্ধান্তও প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই তারা প্রাকৃতিক নির্বাচনকে কেবল ভ্রান্ত নয়, নৈতিকতার আক্রমণাত্মক হতাশা উদ্রেককারী ও দায়িত্বহীন একটি মতবাদ বলে অভিহিত করেন। বাটলার এবং শ-এর প্রতিক্রিয়া থেকে আরেকটি ব্যাপার আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বটিই চার্লস ডারউইনের তত্ত্বকে পূর্ববর্তী বিবর্তনবাদী মতবাদ থেকে ভিন্ন একটি মাত্রা প্রদান করেছে। শুধু পদ্ধতিগত নয়, দার্শনিকও বটে।

বার্নার্ড শ অবশ্য বাটলারের মতো এত মারমুখী ছিলেন না। তিনি ডারউইনের প্রতিভাকে ছোট করে দেখেননি। তাঁর নাটকে তিনি টিএইচ হাক্সলির আদলে প্রফেসর হেনরি হিগিনস চরিত্রটি তৈরি করেন। তবে শ-এর ধারণাগুলি ছিল জগাখিচুড়ি ধরনের। এক ধরনের 'সমাজতন্ত্র' ও 'বিবর্তনবাদে'র মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল তাঁর নতুন ধর্ম। এই ধারণার অপর নাম হচ্ছে সৃষ্টিমূলক বিবর্তনবাদ (Creative Evolution); এই তত্ত্ব অনুযায়ী Elan Vital নামক এক জৈবনিক শক্তি আছে, যা বস্তুকে জটিলতর প্রপঞ্চের দিকে এবং অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায় অসীম পর্যায় পর্যন্ত। তার এসব মতবাদের ছাপ পড়েছে তার *Don Giovanni in Hell* (১৯০৩) এবং *Man and Superman* (১৯১৩) নাটকে।

জৈববিবর্তনবাদ পৃথিবী থেকে হৃদয় ও আশাবাদকে ধ্বংস করেছে, মানুষের নৈতিকতা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এমন অভিযোগ বর্তমানে আর ধোপে টিকছে না, বিশেষত জীববিজ্ঞানীদের দ্বারা এই মতবাদ অবিসংবাদিতভাবে গৃহীত হবার পর এবং ব্যাপকভাবে স্কুল-কলেজে পাঠ্য হওয়ার পর। এছাড়া মানুষের শারীরতত্ত্বের জ্ঞান অগ্রসর হবার পর এখন স্পষ্টভাবে জানা গেছে যে, মানুষের মানসিক ক্রিয়াকর্ম, এমন

কি আবেগ অনুভূতিও মস্তিষ্কের ক্রিয়া এবং এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কিভাবে চলে তার পরিপূর্ণ বস্তুগত (ভৌত ও রাসায়নিক) ব্যাখ্যাও এখন পাওয়া গেছে। ডারউইনের মতবাদের প্রতি বটলার ও শ-এর প্রতিক্রিয়া কিছুটা আবেগতাড়িত। প্রায় একশ' বছর পরও শ-এর নাটক লেখে আনন্দ পায় মানুষ, অথচ অধিকাংশ মানুষই হয়তো জানেন না বা বুঝতেই পারেন না যে এই নাটক শ-এর 'নতুন ধর্ম'কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য লেখা হয়েছিল।

সাহিত্যিক বিদ্রুপ এবং বিবর্তনবাদী মহীরুহ পিতামহ ও পৌত্র

ডারউইনের *অরিজিন অব স্পেসিস* প্রকাশিত হবার বছরতিনেক পরেই ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি, প্রকৃতিবিদ, ধর্মযাজক, সমাজ সংস্কারক এবং উপন্যাসিক চার্লস কিংসলি তার মতবাদকে বিদ্রুপ করে একটি স্যাটায়ার জাতীয় লেখা প্রকাশ করেন। বইটি ছিল শিশুদের উপযোগী করে লেখা এবং লেখক এটিকে তার চার বছরের পুত্রের জন্য উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মের পক্ষ থেকে বিবর্তনের কোনো মানসম্পন্ন বিরোধিতা হয়নি। অক্সফোর্ড বিতর্কের মতো ধর্মীয় বিরোধিতাগুলো যুক্তিহীন এবং গালাগালি ও ধিক্কারে পরিপূর্ণ তবে ঐ শতাব্দীর প্রতিভাবান সাহিত্যিকগণ বিবর্তনবাদ ও ভিক্টোরীয় যুগের বিজ্ঞানের নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে বিরোধিতা ও বিদ্রুপ করে কিছু কিছু সাহিত্যমানসম্পন্ন লেখা লিখেছেন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হচ্ছে চার্লস কিংসলি রচিত *Water Baby* বা *জলশিশু*। গল্পটি ছিল এরকম— টম নামের একটি ছোট ছেলে চিমনি পরিষ্কার করার কাজ করত। একদিন হঠাৎ 'অলৌকিকভাবে' সে চার ইঞ্চি সাইজের ছোট মাছের মতো ফুলকাওয়ালা 'জলশিশু' হয়ে গেল। টমের ভাষায়— "পাঠক, এই বিবর্তনমূলক অবক্ষয়কে অসম্ভব বলে ভাববেন না। এ যুগের বিজ্ঞান বিশারদগণ কিন্তু প্রকৃতিক প্রপঞ্চের ব্যাপারে যথেষ্ট উদার মনোভাবের জন্ম দিয়েছেন যদিও তারা সবসময় নিজের কল্পনার সীমাবদ্ধতাকে প্রকৃতির ওপর আরোপ করে থাকেন।" টমের মন্তব্যে বিদ্রুপের ধার থেকেই বোঝা যাচ্ছে রচনাটি নিছক শিশুতোষ ছিল না।

কিংসলি তার রচনায় আরো দেখান যে, কতগুলো বাচ্চা ছেলেমেয়ে নিজের ইচ্ছেমত যে কোনো কাজ করতে গিয়ে ধীরে ধীরে কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং পরে বানর হয়ে যায়।

কিংসলির ভাষায়— "কে বলে জলশিশুর অস্তিত্ব নেই? আপনি কি করে জানলেন ওরা নেই? আপনি কি ওদের কাছে গিয়েছিলেন? সেখানে গিয়ে যদি দেখা যায় জলশিশুরা নেই তাহলে কি বলা যাবে তাদের অস্তিত্ব ছিল না...।"

কিংসলি মনে করতেন জীবের বিবর্তন সম্পর্কে ডারউইন এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মতবাদ কাল্পনিক ধারণা বা কল্পকাহিনীর সমগোত্রীয়। তাই বিবর্তনবাদের অসারতা প্রমাণ করার জন্য তিনি এক উদ্ভট কাহিনী ফেঁদে এর যথার্থতা দাবি করেছেন। অর্থাৎ সাধারণ পাঠকের কাছে তার মূল বক্তব্য হচ্ছে— আমার লেখাটি যদি আপনাদের কাছে এতই উদ্ভট মনে হয় তবে ডারউইনেরটা নয় কেন?

কিংসলির লেখাটি পাঠ করলে পাঠক বুঝতে পারবেন যে, বিবর্তনের সপক্ষে বহু সহস্র প্রমাণ সম্বলিত (ডারউইন ও অন্যান্য লেখকদের) বইগুলোর একটিও তিনি পড়েননি; এমনকি জীবজগতের সামগ্রিকতা বোঝার জন্য জীববিজ্ঞানের যে ন্যূনতম পাঠ থাকা প্রয়োজন তাও তার ছিল না। তবে রচনার উৎকর্ষতার কারণে একটি মজার রচনা হিসেবে বেশ আদৃত হয়েছিল "জলশিশু"। বিরোধিতাকারীদের মধ্যে এ ধরনের বিদ্রূপাত্মক রচনা উৎসাহদায়ক এবং আসর গরম করার মতো। কিন্তু কিছুটা আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এটি শিশুদের জন্য একটি চিরায়ত মজার রচনা হিসেবে পরিচিতি পেলেও, পরবর্তী প্রজন্মের পাঠকরা হয়তো জানেনই না উনবিংশ শতাব্দীতে বিবর্তনবাদকে বিদ্রূপ করার জন্য এটি রচিত হয়েছিল। বিবর্তনবাদের বিরোধিতাকারীরাও এটিকে আর তাঁদের সপক্ষে ব্যবহার করেননি।

তবে জলশিশুর কাহিনী এখানেই শেষ নয়। এর একটি বাস্তব অধ্যায় আছে, যা কল্পিত কাহিনীর চেয়েও চমকপ্রদ। "জলশিশু" বইটিতে একটি কাল্পনিক ছবি আঁকা হয়েছিল যেখানে দেখা যাচ্ছে একটি কাচের জারের মধ্যে একটি "জলশিশু"কে বন্দি করা হয়েছে এবং ভিক্টোরীয় যুগের বিজ্ঞানের দুই দিকপাল ব্রিটিশ মিউজিয়ামের অ্যানাটমি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রিচার্ড ওয়েন এবং বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক টি.এইচ. হাক্সলি বড় বড় ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ওগুলোকে দেখার চেষ্টা করছেন। ১৮৯২ সালে টি.এইচ. হাক্সলি পৌত্র জুলিয়ান হাক্সলির (যিনি বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞানী ছিলেন) বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। জুলিয়ান "জলশিশু" বইয়ে উপরোক্ত ছবিটি দেখতে পায়। এই উজ্জ্বল শিশু তার কৌতূহল ও আগ্রহকে পরিপূর্ণ করার জন্য তার পিতামহকে একটি চিঠি লিখে জিজ্ঞেস করে— দাদু, তুমি কি জলশিশু দেখেছ? তুমি কি ওকে বোতলের ভেতরে ভরেছিলে? ও বাইরে বের হলে কি খুব অবাক হবার মতো ব্যাপার ঘটবে? আমি কি কোনো দিন ওকে দেখতে পাব?

ছোট্ট জুলিয়ান তার পিতামহের কাছ থেকে সস্নেহ ও অর্থময় জবাব পেয়েছিল। টি.এইচ. হাক্সলি লেখেন— "প্রিয় জুলিয়ান— আমি কখনো জলশিশু দেখিনি। আমি জলের মধ্যে শিশু দেখেছি, আবার বোতলের ভেতরেও শিশু দেখেছি। জলের শিশু কোনো বোতলে ছিল না এবং বোতলের শিশু জলে ছিল না। আমার যে বন্ধুটি (কিংসলি) এই গল্পটি লিখেছেন তিনি খুব দয়ালু এবং চালাক মানুষ। তিনি হয়তো ভেবেছেন আমি তার মতোই জলের মধ্যেও দেখতে পাই। এমন অনেক লোক আছেন যারা একটি জিনিসের মাঝে অনেক বেশি দেখতে পান অথচ অন্যেরা ওই একটি জিনিসে তেমন কিছু দেখেন না। আমার বিশ্বাস তুমি যখন বড় হবে তুমি অনেক বেশি দেখার শক্তিসম্পন্ন একজন হবে, জলশিশুর চেয়েও অনেক চমৎকার সব জিনিস দেখতে পাবে যা অন্যেরা মোটেও দেখতে পাবে না।"

টি.এইচ. হাক্সলির এই আশীর্বাদ তার পৌত্রের জীবনে পরিপূর্ণভাবে সত্য হয়েছিল। জুলিয়ান বড় হয়ে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ জৈববিবর্তন বিজ্ঞানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর লিখিত জৈববিবর্তনের আধুনিক তত্ত্বের সামগ্রিক আলোচনা সম্বলিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ: *Evolution: the Modern Synthesis* প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে।

কিন্তু এর চেয়েও আশ্চর্যের যে ব্যাপারটি ঘটেছে তা হলো জুলিয়ান হাক্সলি সত্যিই তার জীবনে এক জলশিশুকে নিয়েই কাজ করেন, যা জৈববিবর্তনের গবেষণার এক মাইলফলক। ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙ হবার ঘটনা আপনারা সবাই জানেন। ব্যাঙাচি তার স্বভাব ও অন্যান্য জৈবনিক বৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণ মাছের মতো। কিন্তু ব্যাঙাচি যতই পূর্ণতা পেতে থাকে দেখা যায় তা মাছ থেকে ক্রমান্বয়ে স্থলচর একটি প্রাণীতে (ব্যাঙ) পরিণত হতে থাকে। তার পা গজায়, লেজ ছোট হতে থাকে এবং একসময় লেজ বিলুপ্ত হয়, ফুলকা নিঃশেষ হয়ে ফুসফুস গড়ে ওঠে। অর্থাৎ ব্যাঙাচিকে বলা যায়, ব্যাঙের 'জলশিশু'। স্যালমান্ডার নামক একরকম ব্যাঙ জাতীয় প্রাণী আছে যারা ব্যাঙাচি স্তর থেকে আর বড় হয় না। ওদের ফুলকা থেকে যায় পা গজায় না, ফুসফুস গজায় না, লেজ লুপ্ত হয় না এবং সারাজীবন ওরা এরকমই থেকে যায়।

স্যালামান্ডারদের নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে জুলিয়ান হাক্সলি এদের থাইরক্সিন হরমোন খাওয়ান। এর ফলে এদের শৈশব অবস্থা ঘুচতে থাকে অর্থাৎ দেখা যায় স্যালামান্ডারদের পা গজাচ্ছে, ফুলকা নিঃশেষ হচ্ছে এবং লেজ লুপ্ত হচ্ছে ফলে তারা আর 'জলশিশু' থাকছে না। জুলিয়ান নিঃসন্দেহে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি দেখতে পেয়েছিলেন। এই গবেষণা থেকে তিনি এও প্রমাণ করেন যে, বিকাশের একটি স্তরে একটি মাত্র হরমোন একটি প্রাণীর দেহের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অনেক পরিবর্তন ঘটাতে পারে। কোনো একটি জিনের একটি প্রোটিন সিকোয়েন্সের সামান্য পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতেই এই ঘটনা ঘটা সম্ভব।

কাঠগড়ায় বিজ্ঞানের শিক্ষক এবং জৈববিবর্তনবিরোধী আইন

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিবর্তনবাদ বহু বিরোধিতা ও বিতর্কের সম্মুখীন হলেও ঐ শতাব্দীতে বিবর্তনবাদ পাঠ বা শিক্ষা দেবার ক্ষেত্রে কোনো আইনগত বা রাষ্ট্রিক বিরোধিতার ঘটনা ঘটেনি যা ঘটেছিল বিংশ শতাব্দীতে। যদিও সার্বিকভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে জৈববিবর্তনের তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা অনেক কম ছিল, কিন্তু ঐ শতাব্দীতে বিবর্তনবাদ কোনো নিয়মিত বিষয় হিসেবে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অতএব শিক্ষা কার্যক্রমে এর প্রয়োগের ওপর প্রতিবন্ধকতার বাস্তবতাও তৈরি হয়নি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই জৈববিবর্তনবাদের ভিত্তিভূমি ইংল্যান্ড তথা সমগ্র ইউরোপে এই তত্ত্বের বিরোধিতা কমে আসতে থাকে। এমনকি ধর্মও এই তত্ত্বের সাথে আপোস করে এবং এক ধরনের 'ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত' বিবর্তনের ধারণার মাধ্যমে সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিবর্তনের মধ্যে 'আপোস' হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা গেল একটি ভিন্নচিত্র। বেশ কয়েকটি রাজ্যে মৌলবাদীরা বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় বিরোধিতা শুরু করে। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল জৈববিবর্তনের শিক্ষা। ডারউইন ১৮৫৯ সালে জৈববিবর্তনের যে তত্ত্ব দিয়েছিলেন তার মধ্যে বেশ কিছু অসম্পূর্ণতা থাকায় জীববিজ্ঞানী ও প্রকৃতিবিদদের মধ্যেও জৈববিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অস্পষ্টতা এবং অনেক অমীমাংসিত প্রশ্ন ছিল। বংশগতিবিদ্যা ও অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়ে জ্ঞানের অগ্রগতির ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের মধ্যে এসব অমীমাংসিত বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব হয় এবং জৈববিবর্তন যে একটি বাস্তব সত্য ব্যাপার (fact) এ ব্যাপারে জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে সন্দেহমুক্ত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমে জৈববিবর্তন অবশ্য পাঠ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি রাজ্যে মৌলবাদীদের মধ্যে এ বিষয়টি নিয়ে বেশ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মৌলবাদীরা এসব রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সিলেবাস থেকে জৈববিবর্তনকে নিষিদ্ধ করার জোর চেষ্টা শুরু করে। টেনিসিতে সর্বপ্রথম এই চেষ্টা সার্থক হয় এবং ১৯২৫ সালের ২১ মার্চ টেনিসিতে বাটলার অ্যাক্ট নামক আইনের মাধ্যমে এই রাজ্যের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে জৈববিবর্তন শিক্ষা দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়। এই আইনের প্রথম ধারায় বলা হয়: "এই রাজ্যের (টেনিসি) বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি ও সাধারণ বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক এমন কোনো তত্ত্ব পড়াতে পারবেন না যা বাইবেলে বর্ণিত ঐশী সৃষ্টির কাহিনীর বিরোধিতা করে এবং এমন শিক্ষা দেয় যে

নিম্নবর্ণের ইতর প্রাণী থেকে মানুষের উদ্ভব ঘটেছে।" বাটলার অ্যাক্ট প্রবর্তনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুক্তচিন্তার মানুষদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। তাঁরা এই আইন বিরোধিতা করার জন্য আইন অমান্য করার সিদ্ধান্ত নেন। যেহেতু আইনে শিক্ষকদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে অতএব কোনো শিক্ষকের দ্বারাই এই আইন ভাঙতে হবে। আইনটি পাস হবার কিছুদিনের মধ্যেই American Civil Liberation Union নামক একটি প্রগতিশীল সংগঠন একজন জীববিজ্ঞানের শিক্ষককে বিবর্তনবাদ পড়িয়ে এই আইন অমান্য করতে রাজি করান। এই শিক্ষকের নাম ছিল জন টি স্কোপস। ডেটনের একটি হাইস্কুলে স্কোপস বিবর্তনবাদ পড়াতে শুরু করেন এবং এর কিছুদিন পরেই তার বিরুদ্ধে বাটলার অ্যাক্ট ভঙ্গ করার অপরাধে মামলা হয়।

১৯২৫ সালের ১০ জুলাই টেনিসির এক জনাকীর্ণ আদালত কক্ষে এক চাঞ্চল্যকর মামলার সূচনা হয় যা শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, সারা পৃথিবীর আগ্রহী মানুষদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মামলার বিবাদী ডেটনের জীববিজ্ঞান শিক্ষক স্কোপস রাষ্ট্রীয় আইন ভেঙে জৈববিবর্তন পড়ানোর অপরাধে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়ান। এই মামলার জনপ্রিয় নাম দাঁড়ায় "মাংকি ট্রায়াল" বা "বানর বিচার"। মামলায় স্কোপস-এর পক্ষের আইনজীবী হিসেবে দাঁড়ান উদারনৈতিক আইনজীবী ক্লারেন্স ড্যারো, অপরদিকে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান মৌলবাদী রাজনীতিবিদ উইলিয়াম জেনিং ব্রায়ান।

মামলায় দু'পক্ষের বিতর্কে বেশ আগ্রহোদ্দীপক আলোচনার সূত্রপাত হয়। ব্রায়ান তার যুক্তিতে বলেন, বাইবেলের স্পষ্ট ও কেবল একটি মাত্র অর্থ আছে যা মানুষের ব্যাখ্যার অতীত তিনি বলেন, "ঈশ্বর শব্দটির মাধুর্য সেখানেই যে, তাকে বোঝার জন্য কোনো বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় না।" জবাবে ড্যারো তাকে জিজ্ঞেস করেন, বাইবেলে যে লেখা আছে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। সেটা কি তিনি বিশ্বাস করেন? জবাবে ব্রায়ান বলেন, 'না আমি বিশ্বাস করি পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে', অর্থাৎ ড্যারো আদালতের সামনে তুলে ধরেন যে, মানুষ যখন কোনো ঘটনাকে অলৌকিক বলে বর্ণনা করে সেই বর্ণনা নির্ভর করে সেই সময়ে সেই মানুষগুলোর মধ্যে বিদ্যমান ধারণা ও অনুমানের ওপর। ড্যারো যুক্তি দেখান, প্রাচীন যে কোনো গ্রন্থের ব্যাখ্যা অবশ্যই থাকতে হবে কেননা বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়, অসংখ্য উপবিভাগ যারা প্রত্যেকেই তাদের ধর্মগ্রন্থের পৃথক পৃথক ব্যাখ্যাকারী। তাহলে ধর্মগ্রন্থের কোনো ব্যাখ্যা হয় না এ যুক্তিও ধোপে টিকছে না। এরপরও ব্রায়ান উত্তেজিতভাবে বলতে থাকেন যে, তিনি পাথরের বয়স (Age of the rock) নিয়ে চিন্তিত নন বরং 'যুগের পাথর' (Rock of the age) নিয়ে চিন্তিত, বোধ করি বিবর্তনবাদকেই তিনি এ যুগের ওপর চেপে বসা 'পাথর' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, বাইবেলের নতুন ও পুরাতন নিয়মের সর্বত্র যে অলৌকিকতা আছে তাকে বিবর্তনবাদীরা নষ্ট করে দিচ্ছে। এ দেশের করদাতাদের সন্তানদের এমন কিছু পড়ানো যাবে না যাতে ত্রাণকর্তা (যিশু) ও স্বর্গীয় বিষয়ের প্রতি তাদের বিশ্বাস এবং বাইবেল প্রদত্ত নৈতিকতার মানদণ্ড নষ্ট হয়ে যায়।

এর জবাবে ড্যারো আবেগপূর্ণ ভাষায় তার বক্তব্যের উপসংহার টেনে বলেন, "যখন মানুষের হৃদয় থেকে মুক্তচেতনা পালিয়ে যায়...গোঁড়ামি এবং অজ্ঞতা তখন

সক্রিয় হয়ে ওঠে...এবং সর্বদাই তা আরো পরিপুষ্ট হতে থাকে। আজ ত সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর হানা দিয়েছে, কাল বেসরকারি শিক্ষকরাও আক্রান্ত হবেন এবং এরপর ধীরে ধীরে ধর্মপ্রচারক, সাময়িকী বই পুস্তক এবং সংবাদপত্রও আক্রান্ত হতে থাকবে।...শীঘ্রই আমরা হয়তো দেখতে পাবে মানুষে মানুষে বিরোধ, ধর্মমতগুলোর মধ্যকার বিরোধ মহাউল্লাসে আমাদের পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ষোড়শ শতাব্দীর সেই ভয়াবহ দিনগুলোতে যখন গোঁড়ামির আগুনে পোড়ানো হয়েছিল সেইসব মানুষদের যারা মানুষের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি, প্রজ্ঞা ও সংস্কৃতিকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন।"

আদালতের এই বিতর্কে যুক্তির বিচারে ড্যারো জয়ী হয়েছেন বলে উপস্থিত সকলের ধারণা হয়, কিন্তু বিচারক শুধু একটি প্রশ্নের মীমাংসায় সীমাবদ্ধ থাকেন, তা হচ্ছে স্কোপস আইন (বাটলার অ্যাক্ট) ভেঙেছেন কিনা। এই প্রশ্নে স্কোপস দোষীসাব্যস্ত হন এবং তাকে একশ' ডলার জরিমানা করা হয়। পরে অবশ্য বিষয়গত জটিলতার (Technicality) কারণে এই রায় বাতিল হয়ে যায়।

টেনিসিতে এই ফাঁপা বিজয় মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলোকে বেশ উজ্জীবিত করে তোলে। তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য রাজ্যেও বিবর্তনবাদ শিক্ষার বিরুদ্ধে আইন প্রবর্তনের চেষ্টা করতে থাকেন। দক্ষিণের রাজ্য মিসিসিপি ও আরাকানসাসে তাদের এই চেষ্টা সফল হয়। ঐ রাজ্যগুলোতে যথাক্রমে ১৯২৬ ও ১৯২৭ সালে বিবর্তনবাদ শিক্ষার বিরোধী আইন পাস হয়। এইসব আইন পাস হবার পর তা কেতাবি আইনে পরিণত হয়, বহু বছর ধরে বলতে গেলে এগুলোর কোনো প্রয়োগ ছিল না। অবশেষে ১৯৬৭ সালে টেনিসিতে এবং এরপরের বছর আরাকানসাসে এই আইন বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু এখানেই এ কাহিনীর শেষ নয়।

বিশ্বাস রক্ষার সংগ্রাম এবং নানান 'বৈজ্ঞানিক' কৌশল

বিবর্তনবাদকে ধর্মবিশ্বাসীরা যতই এড়ানোর চেষ্টা করুক না কেন, ডারউইনের সময়ের পর থেকে এই মতবাদ ক্রমবর্ধমান হারে জীববিজ্ঞানীদের দ্বারা গৃহীত হতে থাকে এবং এক সময় জৈববিবর্তন জীববিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান শাখা হিসেবে পাঠ্যপুস্তকে স্থায়ীভাবে আসন নেয়। এছাড়া জীববিজ্ঞানের আরো কিছু শাখা যেমন ভূতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়েও এখন জৈববিবর্তনের তত্ত্বের প্রভাব পড়তে থাকে। এর ফলে ধর্মবিশ্বাসের দুটি দিক আক্রান্ত হয়— ১. সৃষ্টিতত্ত্বে প্রকাশিত ধারণা, ২. ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি। শিক্ষাদীক্ষার সাথে সম্পর্কিত এবং গভীরভাবে ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিদের কাছে এ ব্যাপারটি খুব স্বস্তিদায়ক ছিল না। বিংশ শতাব্দীতে জীববিজ্ঞানের নতুন অনেক আবিষ্কারের ফলে বিবর্তনবাদের নতুন সংশ্লেষ (New Synthesis) গৃহীত হয়। এরপর বিবর্তন সম্পর্কে পদ্ধতিগত বিতর্ক কমে যায় এবং বিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটি পরিষ্কার ধারণার সৃষ্টি হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে যেখানে অধিকাংশ বিজ্ঞানী ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন, বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীদের কর্মপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ বস্তুবাদী হয়ে উঠতে থাকে। সরাসরি ধাক্কাটি লাগে যখন ১৯৫৯ সালে শিকাগোতে ডারউইনের অরিজিন অব স্পেসিস গ্রন্থের শতবর্ষপূর্তি উৎসবের সম্মানিত অতিথি বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ এবং জৈববিবর্তন বিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্সলি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "অতিপ্রাকৃত বিষয়টির আর কোনো প্রয়োজন বা স্থান নেই.... পৃথিবীকে সৃষ্টি করা হয়নি, বিবর্তনের মাধ্যমে এর উদ্ভব হয়েছে।"

১৯২৫ সালের স্কোপস ট্রায়ালের পর মার্কিন মুলুকের মৌলবাদীরা এ পর্যন্ত নিষ্ক্রিয়ই ছিলেন। কিন্তু হাক্সলির এই ধাক্কা তাদের দীর্ঘদিনের জমে থাকা অস্বস্তিকে জাগিয়ে দিল। ১৯৬১ সালে হেনরি মরিস নামের এক হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার এবং জন সি হুইটকম্ব জুনিয়র নামক ওল্ড টেস্টামেন্ট বিষয়ক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক যৌথভাবে *The Genesis Flood* (সৃষ্টির প্লাবন) নামের বইটি প্রকাশ করেন। এই দুই গ্রন্থকারের মধ্যে হেনরি মরিস ছিলেন অত্যন্ত সক্রিয় ও করিৎকর্মা লোক। তিনি শুধু বই লিখেই ক্ষান্ত হননি, ১৯৬৩ সালে তিনি 'সৃষ্টিতত্ত্ব গবেষণা সংঘ' (Creation Research Society) এবং ১৯৭২ সালে 'সৃষ্টিতত্ত্ব গবেষণা ইনস্টিটিউট' (Creation Research Institute) প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও এই প্রতিষ্ঠান নিজেকে 'অরাজনৈতিক, ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন বৈজ্ঞানিক' প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাবি করেছিল, প্রকৃতপক্ষে জেনেসিস, নূহ-এর প্লাবন এবং প্রজাতির নিত্যতা সম্পর্কে স্থির বিশ্বাসের কথা ঘোষণা

না করলে তাদের প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়া যেত না। মরিসের এই সংগঠন বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয়ে বিবর্তনবাদ পড়ানোর বিরুদ্ধে আইনি লড়াই শুরু করেন। তাদের দাবি ছিল জৈববিবর্তনের মতো 'সৃষ্টি বিজ্ঞান' (Creation Science) পড়ানোর জন্য স্কুলে একই সমান সময় দিতে হবে। তারা ধর্মীয় কাহিনীকে যেমন 'সৃষ্টি বিজ্ঞান' বলে অভিহিত করেন তেমনি জৈববিবর্তনের তত্ত্বকে বিজ্ঞান নয় অন্য একটি ধর্মীয় মতবাদ হিসেবে চিহ্নিত করেন। *'বাইবেলে রয়েছে উত্তর'* (The Bibel has the answer) নামক তার অপর একটি বইয়ে তিনি বিবর্তনের তত্ত্বকে বাইবেল ও খ্রিস্টধর্মবিরোধী, বিজ্ঞানবিরোধী এবং অসম্ভব একটি মতবাদ হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন

মরিসের প্রতিষ্ঠান তাদের মতবাদের নামকরণ করেছিলেন 'বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব' (Scientific Creationism)। ১৯৮৬ সালে তাদের 'বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বের দর্শন' নামক ক্যাটালগে তারা জীবজগত সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে বলেন, "প্রতিটি মূল জাতের উদ্ভিদ ও প্রাণীকে প্রথম থেকে কার্যকরী ভাবে পরিপূর্ণরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। কোনোটিই অন্য জীব থেকে বিবর্তিত হয়নি... আদি মানবরাও অন্য কোনো প্রাণীর বংশে জন্মায়নি, তাদেরকে গোড়া থেকেই পৃথকভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

হেনরি মরিস ও তার প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা যত মরিয়াই হোক, এর নামের মধ্যে বৈজ্ঞানিক এবং 'গবেষণার' যত কথাই থাকুক, তার আশপাশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কত ছিল তাই দিয়ে সন্দেহ দেখা দিল। যদিও মরিস তাঁর একটি লেখায় বলেন, বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব 'বাইবেলের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি, কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে, সৃষ্টির এই মডেলকে দাঁড় করার জন্য ' তারা এও দাবি করতে থাকেন যে, বহুসংখ্যক নতুন গবেষক জীববিজ্ঞান ও ভূতত্ত্বের সৃষ্টিবাদী ব্যাখ্যার সপক্ষে তাদের গবেষণাকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন।

সৃষ্টিবাদীদের এই দাবি নিয়ে যখন বিতর্ক তুঙ্গে তখন ১৯৮৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন জীববিজ্ঞানী বিষয়টি ভালোভাবে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন। ইউজিন স্কট এবং হেনরি কোল তিন বছর ধরে এক হাজারটি বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল জার্নাল ঘেঁটে সৃষ্টিবাদী গবেষণার এমন নমুনা খুঁজতে থাকেন, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কিন্তু তারা কিছুটা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেন 'বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বের পক্ষে কোনো প্রায়োগিক বা গবেষণামূলক প্রবন্ধ বা নিবন্ধের প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়নি।' কারণ এক হাজারটি জার্নালের একটিতেও কোনো 'গবেষক' সৃষ্টিতত্ত্বের ওপর কোনো গবেষণাকর্ম প্রকাশ করেননি। কিছু সৃষ্টিবাদী ব্যক্তি যারা পেশায় গবেষক, তাদের প্রকাশনাও সৃষ্টিতত্ত্ব বা বিবর্তন সম্পর্কিত কোনো গবেষণা নয়, বরং তাদের নিজেদের ক্ষেত্র যেমন ফুড প্রসেসিং, শিল্পসাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে কিছু গবেষণার কাজ তাদের রয়েছে; কিন্তু তার মধ্যে একটিও জীববিজ্ঞান বিষয়ক নয়। কারণ ঐ সব সৃষ্টিবাদী গবেষণা পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউই জীববিজ্ঞানী ছিলেন না। এরপর স্কট ও কোল বৈজ্ঞানিক প্রকাশনার জন্য পেশ করা হয়েছিল কিন্তু প্রকাশের যোগ্য বিবেচিত হয়নি, এ ধরনের কাজের মাঝে সৃষ্টিতত্ত্বের পক্ষে কোনো গবেষণাকর্ম আছে কিনা তা খুঁজতে থাকেন। ৬৮টি জার্নালে তিন বছরের অধিক

সময়ব্যাপী পেশকৃত এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজারের অধিক নিবন্ধ ও অভিসন্দর্ভ ঘেঁটে তারা মাত্র ১৮টি লেখা পান, যা বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিবাদীদের দ্বারা লিখিত এবং এর মধ্যে ১২টিই হচ্ছে বিজ্ঞান শিক্ষাসম্পর্কিত। বাকি ছয়টি মূলত জৈববিবর্তনকে খণ্ডন করে লেখা নিবন্ধ, যা নিম্নমানের এবং অপেশাদার লেখা বলে জীববিজ্ঞানের জার্নালগুলোতে ছাপার অযোগ্য বিবেচিত হয়। এই ছয়টি লেখার কোনোটিতে নতুন কোনো আবিষ্কার বা অভিজ্ঞতা গড়ে তোলার মতো কোনো গবেষণার ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এই হলো সৃষ্টিবাদীদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার নমুনা। আসলে তাদের সমগ্র প্রকাশনাই 'সৃষ্টিবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান' কর্তৃক প্রকাশিত, কোনো বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান বা জার্নাল তাদের কোনো লেখা প্রকাশের যোগ্য বলে মনে করেনি; বিবর্তনের বিরুদ্ধে তাদের অধিকাংশ যুক্তি এই ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে যে, যেহেতু বিবর্তনবাদের তথ্যগুলো সম্পূর্ণ নয়, অতএব এটি ভুল এবং তার একমাত্র বিকল্প সৃষ্টিতত্ত্ব সঠিক। তাদের মতে, সৃষ্টির ব্যাপারে দু'টি মাত্র বিকল্প হতে পারে— সৃষ্টিতত্ত্ব অথবা ডারউইনের বিবর্তনবাদ, যে কোনো একটি চরম সত্য। অতএব ডারউইনীয় বিবর্তনবাদের খুঁত ধরেই একে বাতিল করে দিয়েছেন এই লেখকরা। মরিস যে প্রপটির সূচনা করেছিলেন তাদের প্রচার ছিল জোরালো। এই প্রচারে কিছু বিজ্ঞানে ডিগ্রিধারী (জীববিজ্ঞানের নয়) প্রফেসর ছিলেন, যার ফলে বহু অভিভাবক, রাজনীতিবিদ এমনকি শিক্ষার সাথে জড়িত ব্যক্তিদেরও ধারণা হয় সৃষ্টিবাদীদের বিশাল বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা রয়েছে, যা একেবারেই সত্য নয়। তাদের এই প্রচারণা অদ্যাবধি বহাল আছে। এখন ইন্টারনেটের কল্যাণে সৃষ্টিবাদীদের বহুসংখ্যক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই ধারণা আরো বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক হয়েছে। বিবর্তনবাদের কবল থেকে বিশ্বাসকে বাঁচাবার এই চেষ্টা মার্কিন দেশে শুরু হলেও সঙ্গত কারণেই তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যায় এবং কখনো মৌলবাদী গোষ্ঠী, কখনো ধর্মীয় দর্শনরক্ষাকারী কোনো গোষ্ঠী বা ব্যক্তি এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এ রকম বইগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুহম্মদ আব্দুর রহীম লিখিত '*বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব*' বইটি; বইটি প্রকাশ করে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষে ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮২ সালে। মৌলানা রহীমের ২১৬ পৃষ্ঠার বইটিতেও যুক্তির ধরন একই রকম, অর্থাৎ বিজ্ঞানীরাই যখন বিবর্তনবাদের বিদ্যমান প্রমাণাদি সম্পর্কে সন্তুষ্ট নন, অতএব এর অসম্পূর্ণতা রয়েছে তাই এটা 'চরম সত্য' নয়। অতএব বর্জনীয়। এইসব যুক্তির অবতারণার জন্য তিনি জীববিজ্ঞানের এবং বিবর্তন সম্পর্কিত বইগুলো থেকে সেসব অংশ উদ্ধৃত করেছেন যেখানে বৈজ্ঞানিকেরা সংশয় প্রকাশ করেছেন বা বলেছেন যে, এই তত্ত্বের কোনো একটি ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রমাণের অভাব রয়েছে। মৌলানা রহীমের বইটির ধরন ও প্রকাশের সময় দেখে অনুমান করা যায় যে, তার কর্মটি মরিসের বইগুলোর অনুসৃতি।

বিজ্ঞান ও মৌলবাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মূল পার্থক্য হলো মৌলবাদ চরম বা পরম (absolute) সত্যকে চূড়ান্ত প্রমাণ ছাড়া, কিন্তু বিজ্ঞান প্রমাণ ছাড়া, সংশয় ছাড়া সত্যকে গ্রহণ করতে নারাজ। সংশয়ের মাধ্যমেই বিজ্ঞান অধিকতর উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হয়। বিবর্তনবাদের কবল থেকে ধর্মবিশ্বাসকে বাঁচানোর জন্য যারা মরিয়া হয়ে উঠেছিল তারা সবাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে ছিল মৌলবাদী এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির

বিরোধী। যদিও তাঁরা কেউ নিজেদের বিজ্ঞানবিরোধী বলতে নারাজ, বরং তাঁরা বিবর্তনকে বিজ্ঞানের গণ্ডি থেকে বের করে দিতে চেয়েছেন, কারণ বিংশ শতাব্দীতে মানুষের মনে বিজ্ঞান ও সত্য সমার্থক হয়ে গেছে।

মাংকি ট্রায়ালের ২য় পর্ব এবং এ দেশের পাঠ্যক্রম

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে কোনো সক্রিয় প্রচেষ্টা ছাড়াই বাটলার আক্ট বাতিল হবার প্রধান কারণ ছিল চল্লিশ বছরে জীববিজ্ঞানে জৈববিবর্তনের আরো পাকাপোক্ত আসন লাভ। এই পর্যায়ে এসে একদিকে যেমন জৈববিবর্তনের জ্ঞান আগের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করে, এর পদ্ধতিগত উন্নতি হয়, তেমনি জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয়ে কর্মপদ্ধতি ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে জৈববিবর্তনের জ্ঞান বিশেষ ভূমিকা রাখতে শুরু করেছিল। স্বভাবতই স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে তা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠতে থাকে। বিজ্ঞানীদের কাছে জৈববিবর্তনের জ্ঞান ক্রমান্বয়ে অধিক প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে থাকলেও মৌলবাদীরা এ তত্ত্বের বিরোধিতায় আবার সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। বিবর্তনবাদ তত্ত্ব পড়ানোর বিরুদ্ধে আইন করার কয়েকটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯৮১ সালে ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের আরাকানসাস রাজ্যে মৌলবাদীরা ঐক্যবদ্ধভাবে লবিং করে Act-590 নামক একটি আইন পাস করাতে সক্ষম হয় যাতে বলা হয় শিক্ষাক্রমে জৈববিবর্তন ও 'সৃষ্টি বিজ্ঞান' (Creation Science)কে 'সমান সময়' দিতে হবে যাতে "উভয় বৈজ্ঞানিক মতবাদকে গুরুত্ব দেয়া হয়।" অর্থাৎ সৃষ্টিতত্ত্বকে সৃষ্টিবিজ্ঞান নাম দিয়ে এর পক্ষে স্কুলের পাঠ্যসূচিতে "বিজ্ঞানের একটি বিষয়" হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বিষয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সমগ্র বিশ্বে যৌক্তিক মানুষদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই প্রতিক্রিয়ার দু'টি দিক ছিল। প্রথমত, 'সৃষ্টিতত্ত্ব' একটি ধর্মীয় বিশ্বাস, বিজ্ঞান নয়। বিজ্ঞান কোনো স্থির বিশ্বাস বা ঐশীবাণী থেকে উদ্ভূত হয় না, মানুষের গবেষণা ও প্রয়োগের ভিত্তিতে যে জ্ঞান উদ্ভূত হয় তাই বিজ্ঞান। বিজ্ঞান স্থির সিদ্ধান্তের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না, বরং জ্ঞানের বিস্তার বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটায়। সৃষ্টিতত্ত্ব ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, বিশ্বাসই যার মূলভিত্তি। এহেন একটি বিষয়কে বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারটিকে সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ও যৌক্তিক মানুষের কাছে বিস্ময়কর বলে প্রতীয়মান হয়। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম ধারায় রাষ্ট্র ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধর্ম থেকে পৃথক রাখার যে ধারা আছে, এ আইন ছিল তারও লংঘন কারণ এই আইনে বিজ্ঞান শিক্ষার কর্মসূচিতে ধর্মীয় বিশ্বাসকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল।

আজ থেকে মাত্র ২০ বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এরকম একটি আইন যৌক্তিক ও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন বহু মানুষকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করেছিল। আর আশ্চর্যের বিষয় হলো বিজ্ঞানের বিষয়ের বেশ কিছু অধ্যাপক, ডক্টরেট করা ব্যক্তি সৃষ্টিতত্ত্বের পক্ষে দাঁড়ান এবং দাবি করেন যে, তাদের এই ধর্মীয় ওকালতি সত্য ঘটনা এবং বিজ্ঞানভিত্তিক। অন্যদিকে অনেক ধর্মতাত্ত্বিক, চার্চের ইতিহাসবিদ এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি জৈববিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞান পড়ানোর অধিকার সংরক্ষণের পক্ষে দাঁড়ান।

দেশের বহু আইনজীবী, বিজ্ঞান ও ধর্মের বিশেষজ্ঞ সাক্ষী এই মামলার সাথে স্বেচ্ছায় যুক্ত হন। যার ফলে আদালতে বিতর্ক জমে ওঠে। সৃষ্টিবাদীগণ তাদের পক্ষে মূল যে দু'টি যুক্তি উপস্থাপন করেন তাহলো— ১. ধর্মে উল্লিখিত মানবসৃষ্টির মতবাদের "বৈজ্ঞানিক ভিত্তি" রয়েছে, ২. জীব সৃষ্টি হওয়ার যে "বিকল্প মতবাদ" ধর্মগ্রন্থে রয়েছে তাকে পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেয়া বিদ্যাচর্চার স্বাধীনতার (Academic Freedom) বরখেলাপ। শুধু তাই নয় তারা দাবি করেন বিবর্তনবাদ কোনো বিজ্ঞান নয় বরং একটি "মানবতাবাদী ধর্ম" যা ধর্মের চেয়েও বেশি বিশ্বাস-নির্ভর। এ প্রসঙ্গে তাদের একটি যুক্তির ধরন ছিল এরকম— "যখন একটি ব্যাঙ হুট করে রাজপুত্রে পরিণত হয় তখন সে কাহিনীকে আমরা বলি রূপকথা, কিন্তু যদি তুমি তার সাথে কোটি কোটি বছর যোগ করো তখন এটা হয়ে যায় বিবর্তনবাদী বিজ্ঞান।"

বিবর্তনবাদের বিশেষজ্ঞগণ আদালতে যুক্তি খণ্ডন করে বলেন, জৈববিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞান কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। বরং বিজ্ঞানের বহু উল্লেখযোগ্য শাখার জ্ঞানের সমন্বয়ে এই বিজ্ঞানের জন্ম। জৈববিবর্তনের এসব ভিত্তির মধ্যে রয়েছে প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, ফসিল বিজ্ঞান, বংশগতিবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, মহাকাশ বিজ্ঞান, তুলনামূলক ব্যবচ্ছেদ বিজ্ঞান (Comparative Anatomy), তুলনামূলক জৈব রসায়ন ও শারীরবিদ্যা (Physiology) এরকম বিজ্ঞানের বহুবিধ শাখাসমূহ এটি বিজ্ঞানের শাখাগুলোর সমন্বিতভাবে এবং পারস্পরিক নির্ভরতায় গড়ে ওঠার একটি নির্দশন। অতএব আলাদাভাবে একে বাতিল করে দেবার কোনো অবকাশ নেই। এই মামলায় বিবর্তনবাদের শিক্ষার পক্ষে দাঁড়ান ধর্মতত্ত্ববিদ ল্যাংডন গিলকি। ধর্ম ও বিদ্যাচর্চার স্বাধীনতা সম্পর্কে সৃষ্টিবাদীরা যে অভিযোগ করেন তার জবাবে গিলকির বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। অ্যাক্ট-৫৯০ সম্পর্কে তিনি বলেন— "এটা (এই আইন) আমাদের সমাজে ধর্মের জন্য এক মহাবিপদ ডেকে আনবে,,, আমার বিশ্বাস আধুনিক সমাজে সবধরনের চিন্তাচেতনাকে মুক্তভাবে বিকশিত হতে না দিলে কোনো সুস্থ ও সৃজনশীল ধর্মচেতনাও থাকতে পারে না। রাষ্ট্রের মাধ্যমে চাপিয়ে দেয়া বা রাষ্ট্র সমর্থিত ধর্মীয় বিশ্বাস কলুষিত, প্রাণহীন এবং অত্যাচারী হতে বাধ্য " তিনি আরো বলেন— "'সৃষ্টি বিজ্ঞান' যেভাবে বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক উপাদানসমূহকে বাতিল করে দিতে উদ্যোগী হয়েছে, যদি সত্যি এরা জয়ী হয়, তাহলে প্রকৃতিবিজ্ঞানের সমগ্র 'সংযোগ জালকে' এরা ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যোগী হবে। যেহেতু সৃষ্টিবাদীরা বৈজ্ঞানিক তথ্য ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহের যথার্থতাকে অস্বীকার করে এবং এর পরীক্ষিত ও সামগ্রীকৃত তাত্ত্বিক কাঠামোকে প্রত্যাখ্যান করে, এরা সত্যিকার অর্থেই সমস্ত বিজ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটিয়ে ছাড়বে।"

এইবার বিচারকগণ তাদের রায় দেন বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞানের পক্ষে। ১৯৮৫ সালের ৫ জানুয়ারি বিচারক উইলিয়াম ওভারটন ৩৮ পৃষ্ঠার রায়ে বলেন, "সৃষ্টি বিজ্ঞান" কোনো বিকল্প বৈজ্ঞানিক মতবাদ বা ব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য নয়। এই আদালতের বিচারে এটি একটি ধর্মীয় বিশ্বাস যা বাইবেলে বর্ণিত খ্রিস্টীয় ঈশ্বর এবং সৃষ্টির কাহিনীর (Genesis) সাথে সম্পর্কিত। অতএব ৫৯০ ধারা (Act-590) দ্বারা সরকারি স্কুলসমূহে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার যে প্রয়াস চালানো হয়েছে তা মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১ম ধারার বিরোধী (এই ধারায় বলা হয়েছে ধর্মকে সকল রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম ও শিক্ষাক্রম থেকে পৃথক রাখতে হবে)। এই রায়ের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য রাজ্যেও "সমান সময়" আইন বাতিল হয়ে যায়

দ্বিতীয় মাংকি ট্রায়াল এবং এর সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলির মধ্যে বেশ কয়েকটি লক্ষণীয় ব্যাপার রয়েছে। প্রথমত, সৃষ্টিবাদীরা নিজেদের মতো অর্থাৎ বর্ণিত সৃষ্টির তত্ত্বকে বিশ্বাস নয় 'বিজ্ঞান' হিসেবে চালাতে চায়। অন্যদিকে বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞানকে তারা 'কাল্পনিক', 'প্রমাণবিহীন' এবং 'এক ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস' বলে চালাতে চায়। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের দেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে, বিজ্ঞানের শিক্ষক, অধ্যাপক, ডক্টরেটধারী ব্যক্তিরাও অনেকে তাদের পক্ষে ওকালতি করেন এবং "সৃষ্টিতত্ত্ব"কে "বিজ্ঞান" হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। আমাদের দেশেও এরকম ডক্টরেটধারী ব্যক্তির অভাব নেই, তবে সবক্ষেত্রেই লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এদের মধ্যে জীববিজ্ঞানের লোক তেমন নেই, মূলত রয়েছে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ব্যক্তিগণ। তবে বিজ্ঞানের ডিগ্রিধারী এসব পণ্ডিতগণ "সৃষ্টি বিজ্ঞান" সম্পর্কে আজ পর্যন্ত এমন কোনো লেখা লিখতে সক্ষম হননি যা বিজ্ঞানের কোনো পেশাদার জর্নালে স্থান পাবার যোগ্য। এরা ফলাও করে প্রচার করে থাকে তাদের "বিজ্ঞানচর্চা" ও "গবেষণার" কথা, অথচ খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে তাদের এই "বিজ্ঞানচর্চা" ফাঁকা বুলি, গবেষণার কোনো নিদর্শনও তাদের কোনো কাজের মধ্যে নেই (আগের অংশে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে)

স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে জৈববিবর্তনবাদ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় থেকে জীববিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়। আশির দশকের শেষ দিক পর্যন্ত এটি যথারীতি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হতে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে নব্বইয়ের দশকে এসে অজ্ঞাত কারণে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের জীববিজ্ঞানের বই থেকে এই বিষয়টি গায়েব করে দেয়া হয়েছে।

এখানে পাঠ্যক্রম থেকে জৈববিবর্তনকে সরিয়ে দেবার জন্য কোনো বিচার-আচারের প্রয়োজন হয়নি, কোনো আইন-কানুনেরও প্রয়োজন হয়নি; তবে মৌলবাদীদের সক্রিয় উদ্যোগেই যে কাজটি হয়েছে সন্দেহ নেই। অত্যন্ত চতুরতার সাথে গোপনেই তারা এই কাজটি সেরেছেন যাতে এই নিয়ে কোনো হৈ চৈ না হয়। শুনেছি আমাদের দেশের কোনো কোনো জীববিজ্ঞানের শিক্ষকও নাকি জৈববিবর্তনের সক্রিয় বিরোধিতা করে থাকেন এবং ছাত্রদের বলেন, এগুলোর কোনো "প্রমাণ নেই"। এই শিক্ষকরাও আমাদের সিলেবাসের গোপন মাংকি ট্রায়ালের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা।

দার্শনিক দোদুল্যমানতা এবং "ওয়ালেস সমস্যা"

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জৈববিবর্তনবাদকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকদের অনেকের মধ্যেই সংশয় ছিল। জীববিজ্ঞানীদের মধ্যেও অনেকে অস্পষ্টতা ও দোদুল্যমানতা দ্বারা আক্রান্ত ছিলেন। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে চমৎকার উদাহরণ হচ্ছেন আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস, যিনি ডারউইনের সাথে যৌথভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জৈববিবর্তনের তত্ত্বের আবিষ্কারক। ব্যাপারটি অত্যন্ত অবাক হবার মতোই; কারণ আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস শুধু প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের আবিষ্কারকই ছিলেন না, তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর এবং পৃথিবীর ইতিহাসেও একজন শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিবিদ। একজন অপেশাদার প্রকৃতিবিদ হয়েও এই কাজে তাঁর নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং অবদান অসামান্য। তিনি নিজে বহু প্রজাতি আবিষ্কার করেছেন। বিবর্তনবাদ ছাড়াও তাঁকে ভূ-প্রাণীবিদ্যার (Zoo-geography) জনক বলা যায়। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছার পদ্ধতিও ছিল পরিপূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক। কিন্তু দার্শনিক দোদুল্যমানতার কারণে দু'একটি ক্ষেত্রে তিনি দাঁড়িয়েছেন ডারউইনের সম্পূর্ণ বিপরীতে।

প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণের সময় ওয়ালেস সর্বদা প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা খুঁজতেন এবং কষ্টসাধ্য হলেও প্রায়শই সে ব্যাখ্যা খুঁজেও পেতেন এবং এ ব্যাপারে নিরলস পরিশ্রম করতে তিনি পিছপা হননি কখনো। কিন্তু কিছু কিছু অতিপ্রাকৃত ঘটনায় তিনি বিশ্বাস করতেন, অর্থাৎ দু'একটি প্রচলিত বিশ্বাসের প্রতি তাঁর বদ্ধমূল আস্থা এর প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা খুঁজতে তাঁকে প্রবৃত্ত করতো না। বরং ব্যাখ্যাহীনতার পক্ষেই তিনি দাঁড়াতেন। একবার আমেরিকা থেকে হেনরি পেড নামক এক বুজরুক ইংল্যান্ডে এসে মৃত ব্যক্তির আত্মা ডেকে নিয়ে আসার বুজরুকি দেখাতে লাগলো। বিবর্তনমূলক জৈববিবর্তনের তরুণ অধ্যাপক এডউইন রে ল্যাঙ্কেস্টার (যিনি ডারউইন ও হাক্সলির শিষ্যও বটে), বেশ আগ্রহভরে পেডের এই খেলা দেখতে গেলেন, মনে মনে আশা ছিল পেডের চাতুরী বা কৌশল ধরে ফেলবেন। পেড একটি অন্ধকার ঘরে খেলাটি দেখাতেন। যে আত্মাকে আনা হয়েছে বলে দাবি করা হতো, পেড তাকে প্রশ্ন করতে, ওখানে একটা শ্লেট রাখা থাকতো, 'আত্মা' শ্লেটের ওপর লিখে জবাব দিত।

প্রশ্ন শুরু হবার আগেই ল্যাঙ্কেস্টার হঠাৎ করে শ্লেটটা ছিনিয়ে নিয়ে দেখতে পান আগেই সেখানে জবাব লিখে রাখা হয়েছে। এভাবে পেডের চাতুরী অনেকটা হাতেনাতে ধরার পর ল্যাঙ্কেস্টার পেডের বিরুদ্ধে আদালতে সাধারণ প্রতারণার মামলা করেন।

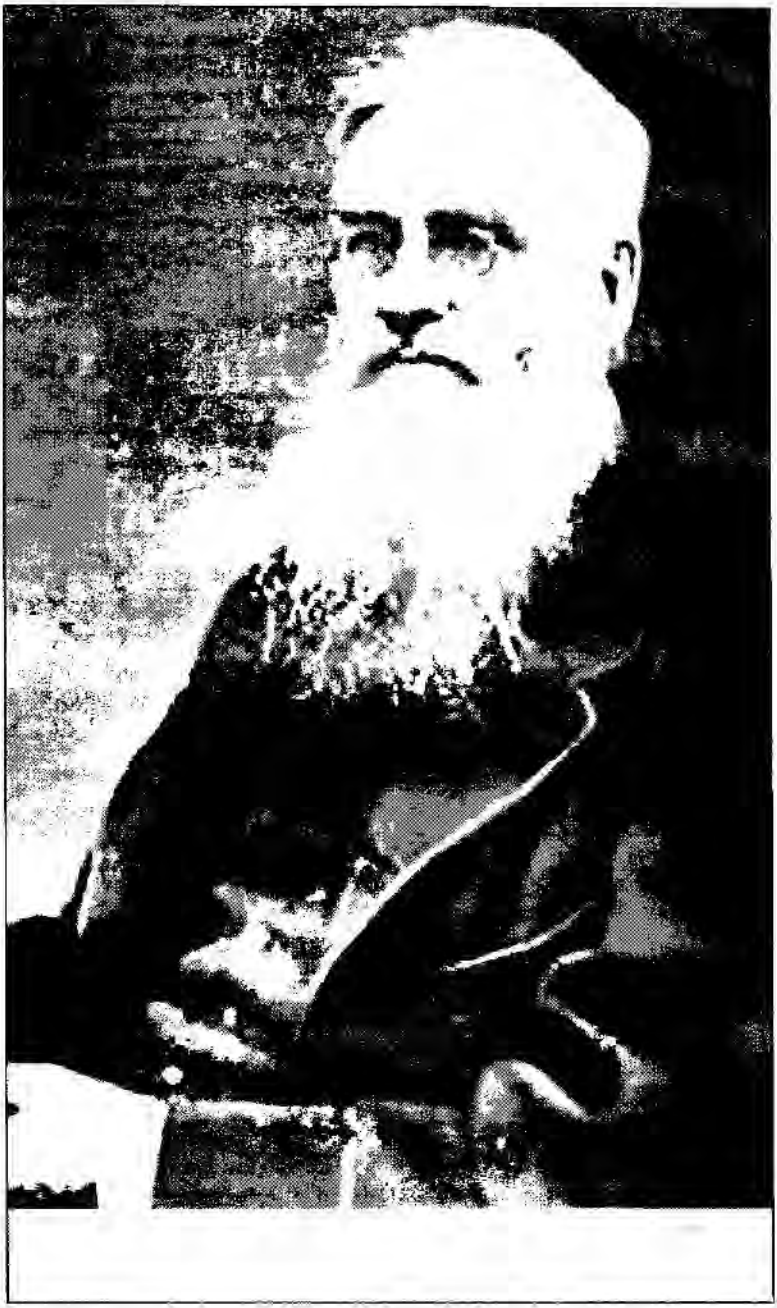

১৮৭৬ সালের নভেম্বর মাসে এই মামলার শুনানি শুরু হয়। বাদী ও বিবাদী দুই পক্ষের সমর্থনে মুখোমুখি হয়েছিলেন বিবর্তনবাদের দুই সহ-আবিষ্কারক চার্লস ডারউইন এবং আলফ্রেড ওয়ালেস "আত্মা-বাদ" (Spiritualism) এর একনিষ্ঠ বিশ্বাসী হিসেবে ওয়ালেস আদালতে পেডের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হন!! সততার জন্য সুবিদিত এবং ডারউইনের সহ-আবিষ্কারক হিসেবে তার সাক্ষ্যের অন্যরকম গুরুত্ব ছিল। আদালতে তিনি সাক্ষ্য দেন যে পেডের কর্মকলাপের মধ্যে কোনো চাতুরী নেই এবং শুধু তাই নয়, পেডের প্রচেষ্টাকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতিবিজ্ঞানের গবেষকদের মতোই একনিষ্ঠ বলে মনে করেন

অন্যদিকে যদিও ডারউইন আদালতে পেডের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আসেননি, এ ব্যাপারে তার বিরুদ্ধমত ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এ ধরনের সকল 'আত্মার খেলা' যে চতুর কৌশল ছাড়া কিছু নয় এবং সরল বিশ্বাসী মানুষকে ঠকানোই এর উদ্দেশ্য তা তিনি ভালোভাবেই জানতেন তিনি ল্যাঙ্কেস্টারকে চিঠি লিখে জানান যে, জনস্বার্থেই তিনি চান এই ধরনের ঠক ব্যক্তিরা যেন তাদের তৎপরতা চালিয়ে যেতে না পারে। মামলা চালিয়ে যাবার জন্য ডারউইন নীরবে ল্যাঙ্কেস্টারকে অর্থ সাহায্য করেন।

আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে পেড বলেন— শ্লেটে কিভাবে লেখা আসে তা তার জানা নেই। নেভিল ম্যাসকেলিন নামের এক জাদুকর আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উঠে দেখাতে শুরু করেন কিভাবে এ ধরনের চতুর কৌশল করা যায়। আদালতে একটি বিশৃঙ্খল হৈ-চৈময় অবস্থা শুরু হলে বিচারক ব্যাপারটি থামিয়ে দেন এবং সে সময়ে ইংল্যান্ডে হস্তরেখাবিদ এবং ভবিষ্যৎ বক্তাদের বিরুদ্ধে যে আইন ছিল সেই আইনে পেডকে দোষী সাব্যস্ত করেন। পরবর্তী কালে অবশ্য কৌশলগত অস্পষ্টতার (technicality) কারণে এই মামলা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়

'পেড বিচার' এভাবে শেষ হলেও এ বিষয়টি অনেক প্রশ্ন এবং গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়কে সামনে নিয়ে আসে অসাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রতিভা এবং বিজ্ঞানচর্চায় একনিষ্ঠতা থাকলেই কেউ প্রচলিত অনেক বদ্ধমূল বিশ্বাস এবং ধারণা থেকে মুক্ত হবেন এমন মনে করার কোনো কারণ নেই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সময়, উপাত্ত সংগ্রহ এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হবার ক্ষেত্রে ওয়ালেস পরিপূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, কিন্তু প্রচলিত বদ্ধমূল বিশ্বাসের প্রতি দুর্বলতার কারণে এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেননি শুধু তাই নয়, অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতো ওয়ালেসও পেডের প্রতারণার শিকার হয়েছেন। কারণ পেডের প্রতারণামূলক কৌশলকে তিনি ধরতে পারেননি এবং সরল বিশ্বাসে একে "অলৌকিক" বলে গ্রহণ করেছেন। এখানে বিশ্বাসের প্রতি পক্ষপাত তার যৌক্তিক চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছে। এরকম নিদর্শন পূর্ববর্তী দুই শতাব্দীর মহান বিজ্ঞানীদের মধ্যেও বিরল নয়।

নিউটনসহ সপ্তদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের বিধান বিশ্বাস করতেন। তাদের ধারণা ছিল ঈশ্বর জগতকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন তা বর্তমান সময়েও অপরিবর্তিত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং দার্শনিকদের চিন্তার প্রভাবে এই ধারণা ভাঙতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে এসে বিশ্ব ও প্রকৃতি যে পরিবর্তনশীল এই ধারণা ব্যাপকতা লাভ করে।

ইংল্যান্ডে এ শতাব্দীর গতিশীল বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা প্রায় সকলেই প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস থেকে মুক্ত উদারনৈতিক ভাবধারাকে গ্রহণ করেছিলেন। এ শতাব্দীর একজন অত্যন্ত মেধাবী, প্রতিভাবান এবং গতিশীল বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও ওয়ালেস ছিলেন দার্শনিকভাবে একজন বিভ্রান্ত (Confused) ব্যক্তিত্ব (যদিও তার কোনো নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস ছিল না)। তার এই বিভ্রান্তি কেবল দার্শনিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তার সামাজিক আচরণ এমনকি বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং গবেষণার ক্ষেত্রেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। জৈববিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে পরবর্তীকালে ওয়ালেস যে বিব্রতকর ভূমিকা রাখেন তাকে অনেকে "ওয়ালেস সমস্যা" নামে অভিহিত করেন।

জৈববিবর্তনবাদের বিরোধিতায় ওয়ালেসের ভূমিকা বিব্রতকর পর্যায়ে চলে যায় যখন তিনি বলতে থাকেন যে, ডারউইন ও তার (ওয়ালেস) নিজের উদ্ভাবিত প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব মানুষের মস্তিষ্কের বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। ডারউইন তার *প্রজাতির উৎপত্তি* (১৮৫৯) গ্রন্থে এই বলে সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন যে— "প্রাকৃতিক নির্বাচন একটি প্রাণীকে সেই পরিমাণ স্বয়ংসম্পূর্ণই করে যেটুকু তার পরিবেশে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয়;" এই ব্যাপারটিতেই ওয়ালেসের খটকা লাগে। তিনি লক্ষ্য করেন, মানুষের পূর্বপুরুষরা যারা আদিম অবস্থায় কিছু কিছু শিকার ও ফলমূল সংগ্রহ করে জীবন নির্বাহ করত তাদের গরিলা বা শিম্পাঞ্জির চেয়ে বেশি বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাদের এতবড় মস্তিষ্ক কেন গড়ে উঠল, যা শিম্পাঞ্জির মস্তিষ্কের চেয়ে মোটামুটি ৩/৪ গুণ বড় এবং তা জটিল ভাষা গঠন ও উচ্চতর গণিতের মতো অনেক জটিল বিষয় চর্চা করতে পারে। মানুষ Ape জাতীয় প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়েছে এ কথা মেনে নিলেও ওয়ালেস দাবি করেন যে, মানুষের মস্তিষ্কের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক অংশের বিবর্তন কোনো "ঐশ্বরিক শক্তি" বা "আত্মার জগৎ" থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

বিজ্ঞানের সাথে ধর্ম ও আত্মাবাদ সমন্বয় করার এই প্রচেষ্টা ওয়ালেস প্রথম শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই ডারউইন এর প্রতিবাদ জানান। তিনি ওয়ালেসকে এক চিঠিতে লেখেন, "আমি ভীষণভাবে আপনার সাথে দ্বিমত পোষণ করি। মানুষের বিবর্তনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কোনো কারণ খোঁজার কোনো প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আমার মনে হয় না।...আমি আশা করি, আপনি আপনার নিজের এবং আমার সন্তানকে (প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব) পরিপূর্ণরূপে হত্যা করবেন না।"

ডারউইন মনে করতেন, মানুষের চেতনা ও জটিল মনের উৎপত্তির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচনই যথার্থ ব্যাখ্যা হতে পারে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে কোটি কোটি বছর ধরে মানুষের চেতনা ও জটিল মনের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। এ ব্যাপারে ওয়ালেসের মনে যে খটকা ছিল পরবর্তীকালের কয়েকটি আবিষ্কারের ফলে তা দূর করার পথ উন্মোচিত হয়। এগুলো হচ্ছে মানুষের ও শিম্পাঞ্জির মধ্যবর্তী প্রাণী অস্ট্রেলোপিথেকাস এবং হোমো ইরেকটাসের ফসিল আবিষ্কার। এই দু'টি মধ্যবর্তী স্তরের প্রাণীরা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁটত, অর্থাৎ তাদের সামনের উপাঙ্গ (forelimb)কে তারা হাত হিসেবে ব্যবহার করতো, ফলমূল সংগ্রহ ও শিকারের মাধ্যমেই এরা খাদ্য আহরণ করত, কিন্তু এদের মস্তিষ্কের আকার ছিল শিম্পাঞ্জির চেয়ে সামান্য বেশি এবং মানুষের চেয়ে অনেক কম। এই আবিষ্কারের ফলে বোঝা যায় যে মানুষের পূর্বপুরুষদের

মধ্যে দু'পায়ে হাঁটার ব্যাপারটি আগে উৎপত্তি হয়েছে, পরে মস্তিষ্কের আকার ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক জীবন-যাপন, ভাবের আদান-প্রদান, হাতের মাধ্যমে সূক্ষ্ম হাতিয়ার ব্যবহার প্রভৃতি যখন মানুষের পূর্বপুরুষদের টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে তখনই মস্তিষ্কের বর্ধিত আকার প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। কোনো একটি প্রজাতির নির্দিষ্ট কোনো জনগোষ্ঠীর কিছু প্রাণীর মধ্যে যদি এমন কোনো পরিবর্তন ঘটে যা ঐ জনগোষ্ঠীর বা প্রাণীর টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে, তাহলে ঐ জনগোষ্ঠীতে ঐ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রাণীরা প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত হতে থাকে অর্থাৎ বেশি বেশি টিকে থাকতে থাকে।

বংশগতির ধারায় ঐ বৈশিষ্ট্যটি ক্রমান্বয়ে একটি জনগোষ্ঠীর সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। ফলে নতুন একটি প্রজাতি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্কের একটি বড় অংশ হাতের সূক্ষ্ম কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, একটি বড় অংশ ভাষা ও বুদ্ধিমত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সূক্ষ্ম হাতিয়ার তৈরি করার ক্ষমতা, তার উদ্ভাবিত বিভিন্ন কৌশল এবং ভাষার ব্যবহারের মাধ্যমে অভিজ্ঞতার বিনিময় ও পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারের ক্ষমতা আন্তঃপ্রজাতিগত সংগ্রামে মানুষের মূল শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। মস্তিষ্কের বিশাল আকৃতি, এভাবে তার টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

মানুষের চিন্তন ও মননের বিকাশকে শুধু মস্তিষ্কের আকার দিয়ে ব্যাখ্যা করলেই ওয়ালেসের প্রশ্নের পরিপূর্ণ সমাধান হয় না। এই বিকাশের ক্ষেত্রে জটিল বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও ভাষার বহুমাত্রিক ব্যবহারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলে আধুনিক বিজ্ঞানীদের ধারণা। ওয়ালেসের প্রশ্ন ও খটকার জবাবের রূপরেখা পরবর্তী পর্যায়ের বিজ্ঞানীরা অনেকটাই দিতে সক্ষম হয়েছেন। যেটুকু এখনো বাকি আছে তা ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীরা সমাধান করবেন। কোনো প্রশ্নের সমাধান খুঁজে না পেলে "এর বস্তুগত ব্যাখ্যা হতে পারে না"— এমন মনে করা একটি ভাববাদী প্রবণতা। কোনো বিজ্ঞানী যদি এই ধারণার বশবর্তী হন তাহলে তার পক্ষে ঐ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা বজায় রাখাই সম্ভব নয়। অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর হিসেবে তিনি যখন প্রচলিত কোনো অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস, যার কোনো গবেষণাগত বা বস্তুগত ভিত্তি নেই, এমন বিষয় হাজির করেন, অসাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অধিকারী হলেও তার বৈজ্ঞানিক বিচারবোধ বিভ্রান্তি দ্বারা আক্রান্ত বলেই ধরে নিতে হয়। এই বিভ্রান্তি তার বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডকেও আক্রান্ত করে থাকে। ওয়ালেসও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর অধিকাংশ গবেষণাভিত্তিক কাজও ১৮৭৬ সালের পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছিল।

আজকাল ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠী বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে দার্শনিক দুর্বলতা ও বিভ্রান্তিকে কাজে লাগিয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিরোধিতা এবং মৌলবাদী নানা ধারণা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়ে থাকেন। ওয়ালেসের ভূমিকাকে তারা লুফে নিয়ে তাকে ধর্মের মহাসৈনিক বলে প্রতীয়মান করতে চাইতে পারেন। ওয়ালেস কোনো ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। তার কর্মের অধিকাংশ ব্যাপ্তিতেই তিনি ছিলেন সৎ, যৌক্তিক ও মানবিক একজন মানুষ। ওয়ালেসের দোদুল্যমানতা ও তার সংশয়ের চেয়ে অনেক বড় হলো প্রকৃতিবিজ্ঞানে তার বিশাল অবদান। অতএব, ওয়ালেসের সংশয়কে পুঁজি করে মৌলবাদী বিজ্ঞানবিরোধীরা বেশিদূর যেতে পারবে বলে মনে হয় না।

20583

জৈববিবর্তনতত্ত্বের অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহার

জৈববিবর্তনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, জীবের প্রজাতিসমূহের পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনের অনুষঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে থাকে। জীবসমূহের এই পরিবর্তনের নিয়ম হচ্ছে প্রথমত বংশগতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে এই পরিবর্তন গৃহীত হওয়া। এই প্রক্রিয়া মোটা দাগে জীবের মধ্যে পরিবর্তনশীলতা এবং পরিবর্তনের নিয়মকে নির্দেশ করে। মানুষের সমাজ ও বিশ্বের অন্যান্য সকল প্রপঞ্চই পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীলতাকে যদি আমরা একটা সাধারণ নিয়ম বলে ধরে নিই, তাহলেও একথা ঠিক নয় যে সকল প্রপঞ্চের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের নিয়ম এক। সকল ক্ষেত্রেই পরিবর্তনের কিছু সাধারণ নিয়ম থাকতে পারে। কিন্তু প্রতিটির কিছু পৃথক নিয়ম রয়েছে যা অন্য প্রপঞ্চের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাই জৈব প্রপঞ্চে পরিবর্তনের নিয়মকে যান্ত্রিকভাবে সামাজিক বা ভৌত প্রপঞ্চে আরোপ করলে তা চিন্তার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির জন্ম দিতে পারে।

এ ধরনের প্রচেষ্টা জৈববিবর্তনবাদের ইতিহাসে বিরল নয়। ডারউইনের *অরিজিন অব স্পেসিস* (১৮৫৯) প্রকাশিত হবার পর থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখার পণ্ডিত ও চিন্তাবিদ এবং বহু সাধারণ মানুষ এই তত্ত্ব দ্বারা আলোড়িত হন। এদের অনেকেই বিবর্তনবাদের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি না করেই নিজস্ব মত ও চিন্তার ধারায় মানুষের সামাজিক প্রপঞ্চের ক্ষেত্রে জৈববিবর্তনের কিছু কিছু নিয়মকে ভুলভাবে প্রয়োগ করা শুরু করেন। কখনো দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের অতি উৎসাহ ও যান্ত্রিক চিন্তা এবং কখনো ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থে এ ধরনের ব্যাখ্যার উৎপত্তি হতে থাকে। এসব ভুল ব্যাখ্যার ফলে জৈববিবর্তনবাদ নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে এর যথার্থতা ও গ্রহণযোগ্যতাও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে থাকে।

সামাজিক ডারউইনবাদ (Social Darwinism)

'সামাজিক ডারউইনবাদ' কথাটির উৎপত্তি ১৮৭০ এর দশকে যখন ডারউইনের জৈববিবর্তনের তত্ত্বকে রক্ষণশীল রাজনীতি ও ধনী ব্যক্তিদের মুনাফালোভী তৎপরতার পক্ষে এবং সাধারণ মানুষের প্রতি সমাজের দায়বদ্ধতার বিপক্ষে ব্যবহারের জন্য বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করা শুরু হয়। এসব ব্যাখ্যা যারা করছিলেন তাদের মধ্যে কেউই প্রকৃতিবিদ ছিলেন না। দার্শনিক, সমাজ বিজ্ঞানী, ধর্মতত্ত্ববিদ এবং শিল্পপতি বা

ব্যবসায়ীরাই মূলত এই কাজটি করেছেন।

সামাজিক ডারউইনবাদের সূচনা ইংল্যান্ড হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই প্রথম ব্যাপকভাবে এর নড়াচড়া শুরু হয়। প্রিন্সটনের অধ্যাপক উইলিয়াম গ্রাহাম সামনার ছিলেন আমেরিকায় এই তত্ত্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রবক্তা। তার মত অনুযায়ী, তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এ সমাজে ধনী ব্যক্তিরাই যোগ্যতম। কারণ লক্ষ লক্ষ মানুষের টিকে থাকার প্রতিযোগিতায় সকলকে ছাড়িয়ে তারাই উঠে এসেছেন। যেহেতু জৈববিবর্তনের সূত্র অনুযায়ী 'যোগ্যতমের টিকে থাকা' হচ্ছে 'প্রাকৃতিক নিয়ম' অতএব তাদের সকল ধরনের কর্মকাণ্ড (অনৈতিক ব্যবসা, শ্রমিক শোষণ) হচ্ছে স্বাভাবিক ঘটনা, এগুলো ছাড়া সমাজের বিবর্তন (উন্নতি অর্থে) সম্ভব নয়। অতএব, তাদের মতে, কোটিপতিরা সামাজিকভাবে সুবিধা পাবার অধিকারী এবং সমাজের জন্য একমাত্র উপযুক্ত ব্যবস্থা হচ্ছে নিয়ন্ত্রণহীন প্রতিযোগিতা।

যথার্থ কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন সর্বাধিক ধনী দুই ব্যক্তি এই তত্ত্বকে গ্রহণ করেন এবং এর প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। দুই ধনকুবের জন ডি. রকফেলার এবং এন্ড্রু কার্নেগি উভয়েই মনে করতেন এই তত্ত্ব শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদকে (Industrial Capitalism) 'বৈজ্ঞানিক' বৈধতা দিয়েছে।

এই ধরনের ব্যাখ্যাগুলোর সূচনা আরো আগের থেকেই এবং এর মূল তাত্ত্বিক ছিলেন ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার। স্পেন্সার ডারউইনের জৈববিবর্তনবাদের দ্বারা আলোড়িত হন এবং জীবজগতসহ প্রকৃতি, সমাজ এবং নৈতিকতার বিবর্তনের নিয়ম সূত্রায়িত করার চেষ্টা করেন।

১৮৬৪ সালে প্রকাশিত স্পেন্সারের *Principles of Biology*-তে তিনি ডারউইনীয় বিবর্তনবাদের ব্যাখ্যা প্রদান করেন যা ঐ সময় (*অরিজিন* প্রকাশিত হবার ৫ বছরের মধ্যেই) জৈববিবর্তনবাদের প্রসারে কিছুটা ভূমিকা রেখেছিল। প্রকৃতপক্ষে ডারউইনের *অরিজিন অব স্পেসিস*'র প্রথম সংস্করণে 'সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট' বা 'যোগ্যতমের টিকে থাকা' কথাটি ছিলই না। প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে স্পেন্সারই প্রথম এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেন যা *অরিজিন* এর পরবর্তী সংস্করণে ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত তাঁর পরবর্তী বই *Principles of Sociology*-তে স্পেন্সার বিবর্তনের এই তত্ত্বকে সামাজিক পরিবর্তনের নিয়ম হিসেবে প্রয়োগ করেন এবং 'সামাজিক ডারউইনবাদের' অবতারণা করেন। তার সামাজিক বিবর্তনের ধারণা অনুযায়ী গরিব শ্রেণী 'যোগ্য নয়' (unfit) বলে তারা 'নিশ্চিহ্ন' (eliminated) হয়ে যাচ্ছে। ধনী-দরিদ্রের অবাধ প্রতিযোগিতাকে বাধাগ্রস্ত করা কোনো যৌক্তিক মানুষের কাজ হতে পারে না। এই অবাধ প্রতিযোগিতাই সমাজের বিবর্তন (উন্নতি অর্থে) ঘটাতে পারে। কিন্তু ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বে 'উন্নতি' হচ্ছে একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে যদি সরল থেকে জটিলতর প্রজাতিতে রূপান্তরকে উন্নতি বলা হয়, তাহলে এর বিপরীতমুখী রূপান্তরকে কি অবনতি বলা যাবে? যেমন একসময় জলচর প্রাণী রূপান্তরিত হয়ে স্থলচর বা উভচর প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। এর বিপরীতে অনেক স্থলচর প্রাণীও যখন

জলচর প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে, সেই বিবর্তন তাহলে কি উন্নতি না অবনতির? মাছের পাখনা (fin) থেকে যখন উভচরের উপাঙ্গ (Limbs) তৈরি হয়েছে, তাকে যদি উন্নতি বলা হয় তাহলে স্তন্যপায়ী তিমি, ডলফিন বা সীল (Seal) এর ক্ষেত্রে উপাঙ্গের পাখনার মতো (fin-like) পরিবর্তনকেও কি উন্নতি বলতে হবে? জৈববিবর্তনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বে উন্নতি বা অবনতির কথা বলা হয়নি, যা স্পেন্সার আরোপ করেছিলেন। তার সামাজিক বিবর্তনের তত্ত্বও এই উন্নতির বিভ্রমের দ্বারা আক্রান্ত।

জৈববিবর্তনের ইতিহাসে হার্বার্ট স্পেন্সারের ভূমিকা থেকে যদি আমরা শিক্ষা নিই, তাহলে কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে পরীক্ষামূলক ভিত্তি (experimental basis) ছাড়া সাধারণীকরণের (generalization) ফলে কি ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেতে পারি। একটি বিষয়কে সংজ্ঞায়িত করা এবং সে সম্পর্কে যুক্তি জাল বিস্তারের ক্ষেত্রে স্পেন্সারের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তার ঘাটতি ছিল পর্যবেক্ষণ ক্ষমতায়, যা একজন বিজ্ঞানীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ। একটি বিষয়ে (তাত্ত্বিকভাবে) অনবরত নানান ধারণা তিনি ছুঁড়ে দিতেন যার মধ্যে অনেকগুলো ভালো বৈজ্ঞানিক প্রকল্প (Hypothesis) হতে পারতো। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে এসব প্রকল্পের ওপর গবেষণা করে এর সত্যতা যাচাই বাছাই করার কোনো প্রবণতা স্পেন্সারের মধ্যে ছিল না। স্পেন্সারের প্রকল্পগুলোকে ডারউইন 'কমপক্ষে আধা ডজন বছর ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষা' করে দেখার জন্য ভালো বিষয় বলে মনে করতেন। কিন্তু তাঁর (ডারউইন) মতে, 'পরীক্ষা নিরীক্ষা না করেই স্পেন্সারের সাধারণীকৃত সিদ্ধান্ত সমূহের কোনো বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই। একটি বিষয়ে ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতেও এ ধরনের সাধারণীকৃত সিদ্ধান্তের কোনো সহায়ক ভূমিকা থাকে না।...এ কারণেই এগুলোর কোনো গুরুত্ব আমার কাছে নেই।' ডারউইনের মতো টি.এইচ. হাক্সলিও স্পেন্সারের মূল সমস্যাটি ধরতে পেরেছিলেন। এক অনুষ্ঠানে স্পেন্সার ঘোষণা দেন তিনি একটি ট্র্যাজেডি লিখেছেন। এর জবাবে হাক্সলি ঠাট্টাচ্ছলে বলেন, স্পেন্সারের ট্র্যাজিডির কাহিনী আমার জানা আছে— 'এটি হলো— একটি অতি চমৎকার মতবাদ (theory), একটি ছোট্ট কুৎসিৎ সত্য (fact) দ্বারা নিহত।'

ডারউইন ও ওয়ালেস বছরের পর বছর ধরে অসংখ্য পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে অসংখ্য তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। এসব তথ্য ও উপাত্ত তাদের দু'জনকে পৃথক পৃথকভাবে একই সিদ্ধান্তে উপনীত করেছে। আগে তথ্য, প্রমাণ সংগ্রহ এবং তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই বিজ্ঞানের পদ্ধতি, আগে ভিত্তিহীন তত্ত্ব দিয়ে তারপর প্রমাণ খোঁজা নয়।

অন্য এক ধরনের সামাজিক ডারউইনবাদী তত্ত্ব প্রদান করেন নৈরাজ্যবাদী দার্শনিক রাশিয়ার প্রিন্স পিটার ক্রপটকিন। ডারউইনের *ডিসেন্ট অব ম্যান* গ্রন্থে প্রাণীদের সামাজিক আচরণ সম্পর্কে পড়ে তিনি প্রথম আলোড়িত হন, পরে সাইবেরিয়া ও মাঞ্চুরিয়াতে বন্যপ্রাণী ও গ্রামীণ মানুষের জীবন পর্যবেক্ষণ করেন। তার মতে, বিবর্তনই প্রাণীদের মধ্যে যথার্থ সামাজিক সহযোগিতা (mutual aid) তৈরি করতে পারে, যদিও প্রাণীরা সর্বদা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্যই সংগ্রাম করছে।

১৯০২ সালে লেখা তার উল্লেখযোগ্য বই Mutual Aid-এ তিনি মানুষের

সমাজের সকল প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক ব্যবস্থাকে প্রয়োজনহীন ও মানব প্রগতি বিরোধী বলে মতপ্রকাশ করেন। তার মতে, জৈববিবর্তন মানুষের মধ্যে বা জীবের মধ্যে যতটা সামাজিক সহযোগিতা তৈরি করে সেটুকুই মানব প্রগতির জন্য যথেষ্ট। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, মানুষকে যদি দুর্নীতি আক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থেকে মুক্ত করা যায় তাহলে একটি 'প্রাকৃতিক ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা' একাই তৈরি হবে।

ক্রপটকিনের ধারণা ব্যাপক কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। তার এই মতবাদ ইতিহাসবোধসম্পন্ন মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ একসময় প্রকৃতিতে সবাই মুক্তই ছিল এবং সামাজিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান গোষ্ঠী স্বার্থেই সামাজিক বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে গড়ে উঠেছে এবং পরে তা 'কলুষিত' হয়েছে। সামাজিক ব্যবস্থার ইতিবাচক দিকগুলো ক্রপটকিনের 'নৈরাজ্যবাদী' একপেশে ধারণায় বিবেচিত হয়নি বলেই মনে হয়।

বর্ণবাদের পক্ষে বিবর্তনবাদের ব্যবহার

'সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীতের মতো বিজ্ঞানও একটি সৃষ্টিশীল মানবিক চর্চা যার গতিপ্রকৃতি স্থান, কাল ও জীবনাচরণের গণ্ডির মধ্যেই বিকশিত হয়ে ওঠে। যদিও জীববিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানীরা দাবি করেন যে, 'নৈর্ব্যক্তিক' সত্য (Objective truth) খুঁজে বের করাই তাদের মূল লক্ষ্য, কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমরা প্রায়ই তাদের এ ব্যাপারে ব্যর্থ হতে দেখি, যখন তারা নিজের পূর্বনির্ধারিত কোনো ধারণা বা বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে থাকেন।' বিশেষ করে মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এসেছে অদ্ভুত কিছু তত্ত্ব যা একপেশে এবং ততটা বস্তুনিষ্ঠ নয়। এর চেয়ে চমক জাগানো ব্যাপার হচ্ছে তারা যেভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা বর্ণবাদকে করেছে উৎসাহিত এবং এর মাধ্যমে বর্ণবাদীরা তাদের অবস্থানকে 'বৈজ্ঞানিকভাবে সিদ্ধ' বলে প্রচার করার সুযোগ পেয়েছে। তবে স্বস্তির ব্যাপার হচ্ছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের বদৌলতে তাদের সেই অবস্থান আর ধোপে টিকছে না বা টিকতে পারছে না।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত জৈববিবর্তনের বইগুলোতেও যেভাবে মানুষের উদ্ভবকে চিত্রায়িত করা হয়েছে তাতে বর্ণবাদ উজ্জীবিত হবার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। ঐসব বইগুলোতে দেখানো হয়েছে বানর থেকে নরবানর জাতীয় প্রাণীর (ape) উৎপত্তি হয়েছে। নরবানর থেকে, হটেনটট (আফ্রিকার নিগ্রো, অস্ট্রেলীয় আদিবাসী; তাসমানীয় প্রভৃতি) এবং এদের থেকে পরবর্তীতে সাদা চামড়ার ইউরোপীয় মানুষদের উৎপত্তি হয়েছে। অর্থাৎ দেখানো হয়েছে মানব বিবর্তনের 'সর্বোচ্চ ও উন্নততম' পর্যায় হচ্ছে ইউরোপীয় মানুষেরা এবং কেউ কেউ আরেকটু এগিয়ে বলেছেন, কালো চামড়ার মানুষেরা নিম্নবর্গের (inferior) পৃথক প্রজাতি (species)

ডারউইনের *অরিজিন অব স্পেসিস* প্রকাশিত হবার পর জৈববিবর্তনবাদের এক নতুন পর্যায় শুরু হয়। এ পর্যায়ের প্রথম দিকের অল্প কয়েকজন বিজ্ঞানী ছাড়া ইউরোপের অধিকাংশ বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ উপরোল্লিখিত সময়ে সাদা চামড়ার

মানুষদের কালো চামড়ার লোকেদের চেয়ে উন্নত স্তরের বলে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ফ্রান্সের আদর্শবাদী চিন্তাবিদ কৌত জোসেফ দ্য গোবিনিউ, ইংল্যান্ডের হুস্টন স্টুয়ার্ট চেম্বারলেন, জার্মানির বিবর্তনবাদী লুডউইগ ওল্টম্যান ও আর্নেস্ট হেকেল এবং মার্কিন ফসিলবিজ্ঞানী ফেয়ার ফিল্ড অসবর্ন প্রমুখ। এরা সকলেই (কালো চামড়ার মানুষদের ওপর) সাদা চামড়ার মানুষদের 'বিবর্তনিক উৎকর্ষতায়' (Evolutionary Superiority) পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছিলেন।

তাঁদের ধারণা ছিল সামাজিকভাবে অনগ্রসর উপজাতীয় এবং সংখ্যালঘু আদিবাসীরা এখনো প্রস্তরযুগে বসবাস করছে, তারা প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বা আদিম মানুষের স্তর এখন অতিক্রম করছে। এই ধারণার চেয়েও গুরুতর বিভ্রান্তি তারা তৈরি করেন যখন, সামাজিক এই অনগ্রসরতাকে তারা জৈবিক বিবর্তনের সাথে গুলিয়ে ফেলেন। কোনো একটি জনগোষ্ঠীকে সামাজিক অনগ্রসরতার ভিত্তিতে জৈবিকভাবে ভিন্ন প্রজাতি বলে চিহ্নিত করা কোনো পেশাদার জীববিজ্ঞানী বা নৃতাত্ত্বিকের কাজ হতে পারে না। প্রজাতি (species) শব্দটি জীববিজ্ঞানের একটি পরিভাষা যার একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে। কোনো একটি জনগোষ্ঠীকে অন্য একটি জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক প্রজাতি বলতে গেলে তাদের মধ্যকার প্রাসঙ্গিক জৈবিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে মিলিয়ে দেখা বা তুলনামূলক বিচার করাই সঠিক পদ্ধতি, যা উপরোক্ত বিজ্ঞানী বা চিন্তাবিদের কেউ করেননি।

জীব বিজ্ঞানে 'প্রজাতি' বলতে বোঝায় একটি জনগোষ্ঠীর সেই সকল প্রাণীকে যাদের মধ্যে আন্তঃপ্রজনন ঘটা সম্ভব এবং এইখানে প্রজননের ফলে একটি প্রজননক্ষম সন্তান উৎপন্ন হয়। যেমন ঘোড়া ও গাধা একই প্রজাতির নয়, কারণ এই দুই প্রজাতি বংশগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অত্যন্ত কাছাকাছি বলে আন্তঃপ্রজনন সম্ভব কিন্তু এদের প্রজননের ফলে উৎপন্ন সন্তান (খচ্চর) প্রজননক্ষম নয়। এবং বর্ণ বা Race বলতে বোঝায় কিছু উপ-প্রজাতি যারা মূল জনগোষ্ঠী থেকে বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে কিছুটা পৃথক এবং প্রজননগত দিক থেকেও বিচ্ছিন্ন (isolated) কিন্তু তা সত্ত্বেও আন্তঃপ্রজনন (inter breeding) সম্ভব। কোনো প্রাণীর বাইরের আবরণ দেখে বা সামাজিক আচরণ দেখে জৈবিকভাবে একে 'উন্নত' বা 'হীন' প্রজাতি বলা যায় না। যেমন অস্ট্রেলিয়ান জাতের বড় গরু বাংলাদেশী গরুর চেয়ে অনেক বেশি দুধ দেয়, তাই বলে বলা যাবে না ঐ জাতের গরু ভিন্ন উন্নততর প্রজাতির, কারণ অস্ট্রেলিয়ান গরুর সাথে এ দেশের গরুর আন্তঃপ্রজনন সহজেই সমাধা করা হয়ে গেছে। কেউ যদি সাদা কবুতরকে কালো কবুতরের চেয়ে বা সাদা বিড়ালকে কালো বিড়ালের চেয়ে উৎকৃষ্ট কিংবা বন্য কুকুরের চেয়ে মানুষকে সাহায্য করা শিকারী কুকুরকে 'উন্নততর বিবর্তনের ফসল' বলে বর্ণনা করে জীববিজ্ঞানের মাপকাঠিতে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

যদিও ডারউইন এবং টি.এইচ. হাক্সলি তাদের উদার রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে আন্তরিকভাবেই বর্ণবাদ ও দাসপ্রথার বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু নিগ্রোয়েড ও আদিবাসীরা 'নিম্নতর' পৃথক প্রজাতি কিনা এ ব্যাপারে তারা খুব স্পষ্ট অবস্থানে ছিলেন না। এই বিষয়ে ডারউইনের কোনো পেশাদার গবেষণা নেই, থাকলে হয়তো এ বিষয়ে তার সুস্পষ্ট সঠিক অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকতো। এইসব অ-ইউরোপীয় এবং

সংখ্যালঘু জাতিসত্তার মানুষদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে এবং দীর্ঘসময় ধরে মেশার সুযোগ তাঁর (ডারউইন) হয়নি কিন্তু একবার খ্রিস্টানধর্মে দীক্ষিত আমেরিকার ফুজিয়ান আদিবাসীদের মধ্যে উন্নত বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক গুণাবলির উপস্থিতি দেখে এ বিষয়ে তার অস্পষ্টতা কিছুটা দূর হয়। প্রথম যুগের বিবর্তনবাদীদের মধ্যে ডারউইনের সহ-আবিষ্কারক আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস ছিলেন এ ধরনের অস্পষ্টতা ও বর্ণবাদী ধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এর কারণ হলো, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রকৃতিবিদদের মধ্যে একমাত্র তিনিই দীর্ঘতম সময় ধরে দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন তীরবর্তী আদিবাসী, মালয় উপদ্বীপ এবং পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় আদিবাসীদের সাথে কাটিয়েছেন। এদের মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে ওয়ালেস বলেন, 'আদিবাসীদের মধ্যে তার এই দীর্ঘ অবস্থানের সময় তার সাথে কখনো বন্দুক রাখার বা দরজার ছিটকিনি লাগানোর প্রয়োজন হয়নি।'

'প্রথিতযশা বিবর্তনবাদীদের মধ্যে জার্মান প্রাণীবিজ্ঞানী আর্নেস্ট হেকেলই তাঁর লেখা ও বক্তৃতায় সবচেয়ে স্পষ্টভাবে বর্ণবাদী ধারণাগুলোকে নিয়ে আসেন। তাঁর সর্বচিন্তার ঐক্য বা Monism-এর মাধ্যমে তিনি ডারউইনের চিন্তাকে যুক্তিবাদ, বস্তুবাদ, বর্ণবাদ, দেশপ্রেম, আর্যবাদ, যাজকবিরোধিতা প্রভৃতির জগাখিচুড়িতে (volatile mixture) পরিণত করেন।' এদিকে স্যামুয়েল মর্টন নামক একজন বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণায় দেখান যে নিগ্রোয়েডদের খুলির ধারণ ক্ষমতা সাদা চামড়ার মানুষদের চেয়ে কম। তবে এই গবেষণাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত জৈববিবর্তন বিজ্ঞানী, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপক স্টিফেন জে গুল্ড (Stephen Jay Gould)। খুলির ধারণ ক্ষমতা মাপার জন্য মর্টন যে পদ্ধতি অনুসরণ করেন, পরিমাপের সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করে একই খুলি মেপে গুল্ড নিগ্রোয়েড ও ককেশয়েড খুলির ধারণ ক্ষমতার মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাননি। অর্থাৎ, পূর্বনির্ধারিত ধারণার প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হবার কারণে মর্টন তার গবেষণায় নিরপেক্ষতার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারেননি।

আমেরিকার আরেক প্রথিতযশা ও প্রভাবশালী ফসিলবিজ্ঞানী, মার্কিন প্রাকৃতিক ইতিহাস মিউজিয়ামের এক সময়ের পরিচালক ফেয়ারফিল্ড অসবর্ন ছিলেন বিজ্ঞানীদের মধ্যে বর্ণবাদের এক শক্তিশালী কণ্ঠ। যদিও তাঁর নেতৃত্বে ফসিল বিজ্ঞানের বহু সফল গবেষণা হয়েছিল। অভিজাত শ্রেণীতে জন্মলাভকারী অসবর্ন ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন দাম্ভিক ও অহঙ্কারী। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে তিনি এবং তাঁর বলয়ের লোকজনই বিবর্তনের সর্বোচ্চ ফসল। তিনি মহাউৎসাহে তার বন্ধু ম্যাডিসন গ্রান্টের কুখ্যাত বর্ণবাদী বই, ১৯১৬ সালে প্রকাশিত *The Passing of the Great Race* এবং ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত *The Conquest of a Continent*-এর ভূমিকা লিখে দেন।

শুধু তাই নয়, ১৯২৭ সালে *Man Rises to Parnassus* নামে তার প্রকাশিত বইয়ে তিনি দাবি করেন বানর বা এপ জাতীয় প্রাণী থেকে মানুষের উদ্ভব হয়নি। বরং এক ধরনের 'আদিম মানব' যারা কখনো বনে থাকেনি তাদের থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। তার এই নতুন প্রস্তাবনার সপক্ষে কোনো প্রমাণ বা নিদর্শন উপস্থিত করা তাঁর

পক্ষে সম্ভব হয়নি। অভিজাত্যের দম্ভ এবং বর্ণবাদী মনোভাবই যে অসবর্নকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও সততা থেকে বিচ্যুত করে মনগড়া মতবাদ প্রদান এবং বর্ণবাদের পক্ষে তার 'বৈজ্ঞানিক' পরিচয়কে ব্যবহার করতে প্রণোদিত করেছে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

খুব বেশিদিন আগে নয়, ১৯৬২ সালে কার্লটন কুন (Carlton Coon) নামক যুক্তরাষ্ট্রের একজন গুরুত্বপূর্ণ ভৌত নৃবিজ্ঞানী (Physical Anthropologist) পক্ষপাতদুষ্ট বর্ণবাদী অনুমান ও 'নির্বোধ' জৈব বিজ্ঞানিক (Nonsensical Biology) ধারণায় পরিপূর্ণ একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বইটির নাম *The Origin of the Races*। বর্ণবাদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট এবং বস্তুনিষ্ঠ না হলেও ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে বইটি গুরুতর সাড়া জাগায় এবং আশ্চর্য হবার মতো ব্যাপার হচ্ছে ১৯৬৩ সালেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নৃবিজ্ঞান বিভাগসমূহের অবস্থান এমন পর্যায়ে ছিল যে এই বইটিকে 'ভুয়া বিজ্ঞান' (Pseudoscience) হিসেবে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ না করে ঐ বইটি নিয়ে নৃবিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে বহু সিরিয়াস আলোচনা হয়েছিল। অবশ্য এই ঘটনাটিকে যদি আমরা তৎকালীন মার্কিন সমাজের পটভূমিতে বিচার করি তাহলে খুব আশ্চর্য হবার কিছু থাকে না। উপরোক্ত সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ হবার শতবর্ষ পূর্ণ হলেও বর্ণবাদ মানুষের চিন্তায় ও সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপকভাবে ছিল। ১৯৬৩ সালে বর্ণবাদীদের হাতে বর্ণবাদবিরোধী রাষ্ট্রপ্রধান (জন এফ কেনেডি) এবং ১৯৬৯ সালে বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র) এর খুন হবার ঘটনার মধ্য দিয়ে এই দশকে যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবাদী চিন্তা ও বর্ণবাদী মানুষদের অবস্থাকে অনুমান করা যায়। সমাজের মধ্যে বর্ণবাদী চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব থাকলে তার দ্বারা বিজ্ঞানী, গবেষক ও পণ্ডিতরাও আক্রান্ত হবেন, এ আর বিচিত্র কি!

জৈববিবর্তনের বর্তমান গবেষণায় অত্যাধুনিক জৈব রাসায়নিক কৌশল স্পষ্টভাবে উন্মোচিত করেছে যে, মানুষের বর্ণসমূহের মধ্যে বংশগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য অতি সামান্য। এমনকি একই বর্ণের দুইজন মানুষের মধ্যে বংশগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের চেয়ে ভিন্ন বর্ণের দুইজন মানুষের মধ্যে বংশগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য কম হতে পারে। কিছুদিন আগে মানুষের পরিপূর্ণ জিনগত ম্যাপ তৈরি করার যে কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে তার মাধ্যমে ব্যাপারটি পরিপূর্ণভাবে প্রমাণ করা সম্ভব। যদি পৃথিবীর বাকি সব মানুষ ধ্বংস হয়ে যায় এবং একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মানুষেরা শুধু বেঁচে থাকে সেক্ষেত্রেও মানবপ্রজাতির শতকরা ৯৯ ভাগ জিন অক্ষত থাকবে।

জৈববিবর্তন তত্ত্বের বর্ণবাদী অপব্যবহারের ইতিহাস এখানেই শেষ নয়।

ফ্যাসিবাদী নৃশংসতা এবং জৈববিবর্তনবাদ

মানবজাতির ইতিহাসের জঘন্যতম ও কলঙ্কজনক যে বর্ণবাদী ঘটনা তা সংঘটিত হয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে সেই ঘটনার তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে জৈববিবর্তনবাদকে ব্যবহার করা হয়েছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে 'সভ্য' এবং উন্নত জনপদ ইউরোপ মহাদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ ওই বর্ণবাদী উন্মাদনার শিকার হয়ে

প্রাণ দিয়েছেন। এই উন্মাদনা বিশ্বব্যাপী এক অমানবিক যুদ্ধকে ছড়িয়ে দেয় যা সারা বিশ্বে কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটায়, আরো ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে করে বিকলাঙ্গ ও আশ্রয়হীন, সমগ্র বিশ্বজুড়ে দেখা দেয় মহামারি, অভাব ও দুর্ভিক্ষ। হ্যাঁ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথাই বলছি। এই যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল কারণ জার্মানিতে নাজি দল নামক একটি ফ্যাসিবাদী দল অধিকাংশ জার্মানদের মধ্যে বর্ণবাদী এক উন্মাদনা তৈরি করেছিল। তাদের মত অনুযায়ী 'আর্য' জাতির সবচেয়ে উন্নত ধারা 'নীল চোখযুক্ত' জার্মানরাই পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত জাতি। তাদের দেশে অবস্থানরত বহু সংখ্যক ইহুদি তাদের 'কলুষিত করছে'। অতএব, 'ইহুদিদের সে দেশে থাকার বা বেঁচে থাকার অধিকার নেই'। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত নাজি জার্মানির সৈন্যরা এবং তাদের মিত্ররা তাই কয়েক লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করেছিল।

তাদের এই মতবাদের যথার্থতা দেবার জন্য তারা ব্যবহার করেছিল তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব এবং জৈববিবর্তনবাদকে। তাদের এই অপপ্রচেষ্টার ফলে জন্ম নেয় এক ধরনের ভুয়া ডারউইনবাদ (Pseudo-Darwinism Theory)। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যেসব বিজ্ঞানীদের বর্ণবাদ ঘেঁষা অবস্থান এই ভুয়া বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তৈরিতে সহায়তা বা প্রভাবিত করেছে তাদের কয়েকজনের কথা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। আরো কয়েকজনের কথা বলতে চাই। তবে তার আগে নাজি মতবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি কিভাবে গড়ে উঠলো তার পটভূমি সম্পর্কে সংক্ষেপে দু'একটা কথা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক মনে করছি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ প্রাচ্যবিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম জোনস দেখান যে ভারতীয় সংস্কৃত (মূলত আর্য) ভাষা, ফারসি এবং ইউরোপীয় ভাষাসমূহ যেমন গ্রিক, ল্যাটিন, কেলটিক, জার্মান প্রভৃতি ভাষার সাথে সম্পর্কিত। এসব ভাষার মৌলিক বাচনভঙ্গি ও ব্যাকরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলনা করে তিনি দেখাতে সক্ষম হন যে, এই ভাষাগুলো একই মূলভাষার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। প্রাচীন পারস্য ও ভারতে আগমনকারী আর্যদের নামানুসারে তিনি এই মূলভাষার নাম দেন আর্যভাষা (Aryan Language) এবং এই ভাষাগোষ্ঠীর নাম হয় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠী। এই ভাষাগোষ্ঠী 'আর্য' ভাষাগোষ্ঠী বলেও পরিচিতি লাভ করে। ইউরোপে আর্যদের বিষয়টি নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে এক ধরনের ভাবাবেগ দানা বেঁধে ওঠে। একটি যাযাবর জাতি 'ভোলগার পাড়' থেকে ইউরোপে এসে 'সমগ্র ইউরোপকে সভ্য করে তুলছে' এমন একটি কাল্পনিক চিত্র সুধী মহলে জনপ্রিয় হতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, ভাষাবিদগণ, জার্মানিতে গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় এবং ফ্রাঙ্ক বপের উদ্যোগে 'আর্য' বিষয়াবলি (Aryan Studies) গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

একটি জাতি উঠে এসে 'সমগ্র ইউরোপের মানুষদের সভ্য করে তুলেছে' এইরকম একটি ধারণার মধ্যে যুক্তির চেয়ে পৌরাণিক (mythic) দ্যোতনাই বেশি পাওয়া যায়। এই পৌরাণিক দ্যোতনাই বোধ করি ঐ সময়ের পণ্ডিতদের এক ধরনের ভাবাবেগে আপ্লুত করেছিল। আর্যদের অনুপ্রবেশ অনেক আগে হয়েছিল কিন্তু কবে হয়েছিল কেউ জানে না। আর্যজাতির অস্তিত্ব আদৌ ছিল কিনা, আদৌ তাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল

কিন্তু সেই প্রশ্ন না তুলে তারা নিয়োজিত হলেন আর্যজাতির জাতিগত বৈশিষ্ট্য এবং উৎপত্তিস্থল খুঁজে বের করার প্রচেষ্টায়।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য বর্ণবাদী তাত্ত্বিকের উদ্ভব ঘটে যারা তাদের লেখার মাধ্যমে সাদা চামড়ার মানুষদের জাতিগত উৎকর্ষতার সপক্ষে এক ধরনের চিন্তাগত অবস্থান গড়ে তোলেন। চিন্তাবিদ ও বৈজ্ঞানিকদের অনেকের ওপর এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ফ্রান্সের প্রাচ্যবিদ, কূটনীতিক, ইতিহাসবিদ ও সাংবাদিক কাউন্ট আর্থার দা গোবিনিউ (Arthur de Gobineau) এই দলের পুরোধা। ১৮৫০ সালে প্রকাশিত তার *Essays on the Inequality of the Races* নামক গ্রন্থে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেন যে মানবজাতি তিনটি প্রধান বর্ণে বিভক্ত। এর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণ হচ্ছে 'সাদা' চামড়ার মানুষরা এবং সর্বনিকৃষ্ট হচ্ছে 'কালো' চামড়ার মানুষেরা এবং মাঝখানে রয়েছে হলুদ চামড়ার মানুষেরা। তিনি আরো দাবি করেন যে সাদা চামড়ার মধ্যে আর্য শাখাটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ।

ইংল্যান্ডে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক মাক্সমুলারও ছিলেন ইউরোপীয় সভ্যতার আর্য উৎস এবং আর্যদের শ্রেষ্ঠত্বের একজন অন্যতম প্রধান প্রবক্তা। কিন্তু গবেষণা করতে করতে যখন তিনি অনেক বেশি তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করলেন তখন তিনি বুঝতে পারেন ইউরোপীয় সভ্যতা একটি মাত্র জাতির দ্বারা গড়ে ওঠেনি। তিনি আরো উপলব্ধি করেন যে ভাষার সাথে বর্ণ (race) বা গাত্রবর্ণের কোনো সম্পর্ক নেই, যে কোনো বর্ণের যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে যে কোনো ভাষা শেখা সম্ভব। এ শতাব্দীর শেষের দিকে (১৮৮৮) তিনি লেখেন 'একজন নৃবিজ্ঞানী যখন আর্যজাতির রক্ত, চোখ আর চুলের উৎকর্ষতার কথা লেখেন তিনি যেমন পাপী, তেমনি একজন ভাষাতত্ত্ববিদ যখন লম্বা মস্তিষ্ক (dolichocephalic) শব্দকোষ বা চওড়ামস্তিষ্ক (Brachycephalic) ব্যাকরণের কথা বলেন তিনিও তেমন পাপী।' গবেষণার প্রতি সৎ ছিলেন বলেই মূলার প্রচলিত ধারণার গণ্ডি পেরিয়ে প্রকৃত সত্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছিলেন কিন্তু বর্ণবাদের সপক্ষে তার প্রথম দিককার শিক্ষা ও লেখালেখির যতটা প্রভাব তৎকালীন ইংল্যান্ড ও ইউরোপের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ছিল, শেষ জীবনের লেখা ততটা প্রভাব ফেলতে পারেনি।

ইউরোপের ধারাবাহিকতায় আমেরিকাতেও বর্ণবাদী তাত্ত্বিকদের লেখালেখি চলতে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯১৬ সালে প্রকাশিত মেডিসন গ্র্যান্টের *The Passing of the Great Race* (মহান জাতির অগ্রযাত্রা) এবং ১৯২০ সালে প্রকাশিত লথর্প স্টডার্ডের *Rising Tide of Color Against White Supremacy* (সাদা শ্রেষ্ঠত্বের বিরুদ্ধে জেগে ওঠা কালো জোয়ার)।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক পর্যন্ত বহমান বর্ণবাদী এই তরঙ্গের জোয়ারের পেছনে সামাজিক কারণ অবশ্যই ছিল। এই সব লেখালেখির মাধ্যমে যে বর্ণবাদী প্রচারণা চলেছে তা ১৯৩০ এর দশকে জার্মানিতে নাজি উন্মাদনার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। ইংরেজ বর্ণবাদী লেখক হিউস্টন চেম্বারলেন তার *ফাউন্ডেশন অব নাইনটিনথ সেঞ্চুরি* গ্রন্থে

লেখেন— 'যদি প্রমাণিত হয়ও যে অতীতে আর্য জাতির অস্তিত্ব ছিল না সেক্ষেত্রেও আমাদের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে ভবিষ্যতে এমন একটি জাতি গড়ে উঠবে এটাই (এই আকাঙ্ক্ষা) হলো একজন সক্রিয় মানুষের মতদর্শিক অবস্থানের নির্ধারক।'

অর্থাৎ যুক্তি, তথ্য ও প্রমাণ নয়, নিজেদের বর্ণবাদী আকাঙ্ক্ষার প্রভাবে তৈরি হচ্ছে তত্ত্ব। এরকম মতান্ধতা দিয়েই জার্মানিতে নাজিবাদের উত্থান ঘটে। নাজিরা তাদের স্বপ্নের আর্য জাতি গড়ে তুলতে গিয়ে নাজি সামরিক অফিসারদের নিয়োগ করেছিল কিছু নির্বাচিত মহিলাকে গর্ভবতী করার জন্য। তাদের এই পরীক্ষার ফলে কোনো 'উন্নত' মানুষের জন্ম হয়নি বরং জন্মেছে কিছু অতি সাধারণ এতিম শিশু। আর্য জাতির 'বিশুদ্ধতা' রক্ষায় ব্যর্থতার প্রচেষ্টায় লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা ও নিপীড়ন করা হয়েছে। এই কাণ্ডগুলোর সাথে যুক্তি ও সুস্থ চিন্তার কোনো সম্পর্ক ছিল না।

ইদানীং জৈববিবর্তনবাদের বিরোধীরা বা সৃষ্টিবাদীরা বলছে জৈববিবর্তনবাদ একটি বর্ণবাদী তত্ত্ব, কারণ জার্মান নাজিরা তাদের তত্ত্বের সপক্ষে বিবর্তনবাদকে ব্যবহার করেছে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে জৈববিবর্তনের স্বীকৃত বিজ্ঞানীরা অনুন্নত জাতিসত্তাগুলোকে 'নিম্নতর প্রজাতি' বলে মনে করতেন। জার্মানিতে নাজিরা তাদের বর্ণবাদী নিষ্ঠুরতার পক্ষে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদের মতবাদকে ব্যবহার করেছে। এদের মধ্যে উপরোল্লিখিত বর্ণবাদী তাত্ত্বিকরা ছাড়াও মার্কস, ডারউইন, যীশুখ্রিস্ট প্রভৃতি মনীষীরা রয়েছেন। ডারউইন ও হাক্সলিসহ ঊনবিংশ শতাব্দীর বিবর্তনবাদী ও প্রাণবিজ্ঞানীদের অনেকের মধ্যেই মানুষের অনুন্নত জাতিসত্তাগুলোর বিবর্তনিক (Phylogenetic) অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা ছিল না, তারা মনে করতেন হয়তো অনুন্নত এই জাতিসত্তাগুলো 'ভিন্ন প্রজাতির'। হয়তো বলছি এ কারণে যে ডারউইন ও টি.এইচ. হাক্সলি যে মাত্রার বিজ্ঞানী, পদ্ধতিগত গবেষণা না করে বা যথেষ্ট তথ্য প্রমাণাদির মাধ্যমে নিশ্চিত না হয়ে কোনো বিষয়ে জোর দিয়ে কোনো কথা বলার লোক তারা নন।

মানব বিবর্তনের ওপর হাক্সলির *ম্যানস প্লেস ইন নেচার* এবং ডারউইনের *ডিসেন্ট অব দ্য ম্যান* বই দুইটি যখন লেখা হয় তখন মানুষ ও তার পূর্বপুরুষদের ফসিল সে মাত্রায় পাওয়া যায়নি। সে কারণে বইগুলোতে আপাত পর্যবেক্ষণ থেকে কিছু কিছু মন্তব্য করা হয়েছে যা হয়তো পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তবে ডারউইন ও হাক্সলির মূল প্রতিপাদ্য ছিল Ape-দের সাথে মানুষের সাদৃশ্য ও বিবর্তনিক নৈকট্য। তারা দেখাতে চান শারীরিক ও আচরণগত দিক থেকে বানরের (monkey) চেয়ে মানুষের সাথে এদের সাদৃশ্য বেশি। আপাত পর্যবেক্ষণ থেকে ডারউইনের মধ্যে সামাজিকভাবে অনুন্নত জাতিগুলোর সম্পর্কে যে ধারণা হয়েছিল তার থেকে কিছু কিছু মন্তব্য তিনি করেছিলেন যাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভ্রান্তি ছিল। অনুন্নত জাতিসত্তাগুলোকে যেহেতু তিনি মনে করেছিলেন ভিন্ন প্রজাতির, সে কারণে *দি ডিসেন্ট অব ম্যান* গ্রন্থে তিনি ধারণা করেন মানুষের এই 'উন্নত' ও 'অনুন্নত' প্রজাতির মধ্যে অন্তঃপ্রজাতিগত সংগ্রাম চলবে এবং অনুন্নত অংশ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

ডারউইন ও হাক্সলি বর্ণবাদ ও দাসপ্রথার বিরোধী ছিলেন তা তার শত্রুরাও অস্বীকার করেনি। মানুষের বর্ণ (Race) সম্পর্কে তাদের কিছু ভুল ধারণা তাদের

জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থেকেই জন্ম নিয়েছিল। পরবর্তীকালে ফসিলের সাক্ষ্য, এবং বিশেষত নৃতাত্ত্বিক (Anthropological) গবেষণার অগ্রগতির ফলে নিগ্রয়েড, মঙ্গোলয়েড ও অন্যান্য জাতিসত্তাসহ সমস্ত বর্ণের মানুষ যে একই প্রজাতির তা উন্মোচিত হয়। বিজ্ঞানের এবং বিজ্ঞানীদের জ্ঞানে সীমাবদ্ধতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। ধর্ম গ্রন্থের মতো বিজ্ঞান অনড়, অপরিবর্তনীয় ও অলঙ্ঘনীয় নয়; বরং সময়ের সাথে সাথে নিরন্তর সংশয়ের মধ্য দিয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি কাটিয়ে ক্রমাগত উৎকৃষ্টতর ও অধিক পরিপূর্ণ অবস্থার দিকে বিজ্ঞান এগিয়ে যায়। সীমাবদ্ধতা থাকে বলেই একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সব অনুসিদ্ধান্ত সত্য হয় না বা স্থির থাকে না। তাই বলে ঐ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে অর্থহীন বা বিজ্ঞানীকে মূর্খ বলা যায় কি?

বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞানীরা মানবজাতির বর্ণ বা Race সম্পর্কে ভুল ধারণামুক্ত হয়েছেন কোনো নৈতিকতার বা ধর্মবিশ্বাসের বলে নয়, জ্ঞানের বলে। নৃবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, বংশগতি বিদ্যা, জৈব রসায়নসহ বিজ্ঞানের বেশ কয়েকটি শাখা এ সংক্রান্ত সব ধরনের অস্পষ্টতাকে দূর করেছে। অতএব, ঊনবিংশ শতাব্দীর বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীদের কিছু অস্পষ্টতা ও অজ্ঞতাপ্রসূত অনুসিদ্ধান্ত, অনুমান ও ভাবীকথনের ত্রুটিকে দেখিয়ে যাঁরা বলেন 'বিবর্তনবাদ একটি বর্ণবাদী তত্ত্ব', মতান্ধ বিরোধিতার উদ্দেশ্য থেকেই তাদের এসব চেষ্টার জন্ম হয়ে থাকে, কোনো মানবিক বা বৈজ্ঞানিক সদিচ্ছা থেকে নয়।

জৈববিবর্তন নিয়ে যৌক্তিক বিতর্ক

ডারউইন ও ওয়ালেসের প্রাকৃতিক নির্বাচনভিত্তিক জৈববিবর্তনের তত্ত্ব পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি প্রস্তাবনা। কারণ এই তত্ত্বই সর্বপ্রথম যৌক্তিকভাবে দেখাতে পেরেছিল যে, কোনো 'সচেতন পরিকল্পনা' ছাড়াই প্রাকৃতিক নিয়মেই গড়ে উঠতে পারে বিভিন্ন প্রজাতির জীব এবং জীবের জটিল শারীরবৃত্ত। এরকম একটি প্রস্তাবনা দ্বারা আক্রান্ত হয় মানুষের বহুযুগ ধরে লালিত চিন্তার ধরন, দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বাস। অতএব, প্রথমেই এ তত্ত্বের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত বিরোধিতা আসতে থাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের এবং বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের কাছ থেকে। এই স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যে আবেগ, উৎকণ্ঠা ও ক্ষোভ যে মাত্রায় ছিল বৈজ্ঞানিক উপাদান বা যুক্তি সে তুলনায় ছিল না বললেই চলে। *Origin of Spacies* গ্রন্থে ডারউইন তার যুক্তির পক্ষে যে বিপুল পরিমাণের প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ (observation) অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে যে বিপুল পরিমাণ নিদর্শন উপস্থাপন করেছিলেন তার উপযুক্ত পাল্টা যুক্তি বা নিদর্শন উপরোক্ত প্রাথমিক বিরোধিতায় ছিল না।

ডারউইনের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা এবং ত্রুটি নিয়ে যৌক্তিক বিতর্কের সূচনা হয় উনিশ শতকের সপ্তম ও অষ্টম দশকে যখন বিজ্ঞানী ও যৌক্তিক মানুষেরা ব্যাপকভাবে এই তত্ত্ব পাঠ ও অধ্যয়ন করতে শুরু করেন। প্রাথমিক পর্যায়ের আবেগময় বিরোধিতাকারীদের কেউ এ তত্ত্বের গভীরে যাননি বা যেতে পারেননি।

জৈববিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে বিতর্ক হয় এবং সেখানে পক্ষে ও বিপক্ষে যে যুক্তির অবতারণা করা হয়ে থাকে, আমাদের বর্তমান আলোচনায় তার অনেকগুলোই বাদ দেয়া হয়েছে। এর কারণ এ ধরনের তর্ক-বিতর্কে জৈববিবর্তনের পক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দলেই জৈববিবর্তন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাব থাকে। যেসব বিষয় জৈববিবর্তন তত্ত্বের প্রস্তাবনা নয় সেগুলোকেই তারা মূল প্রস্তাবনা হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, উভয়পক্ষই জৈববিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভুল ও অস্পষ্ট ধারণার ওপর ভিত্তি করে তাদের মতের পক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করেন। ফলে এই যুক্তিগুলোর বেশির ভাগই এতটাই বিভ্রান্তিকর হয়ে ওঠে যা প্রকৃতিবিজ্ঞানের একটি বিষয়কে বোঝার জন্য অনুকূল নয়।

এ বিতর্কের গভীরে যাওয়ার আগে এর উৎস সম্পর্কে কিছুটা ভাবার প্রয়োজন আছে। এ বিতর্কের উৎস মূলত দার্শনিক। অর্থাৎ যারা দার্শনিকভাবে এ তত্ত্বের অনুসিদ্ধান্তগুলো একেবারেই মেনে নিতে পারছেন না তারাই এ তত্ত্বের ঘোরতর

বিরোধী এবং রয়েছেন এ বিতর্কের সামনের সারিতে। বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে বিশেষ করে জীববিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে এর তেমন কোনো বিরোধিতা হয়নি। অন্যসব বিজ্ঞানের মতোই বিজ্ঞানের এই শাখায়ও সীমাবদ্ধতা আছে, আছে সমাধানের অতীত কিছু সমস্যা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিজ্ঞানের যে কোনো শাখায় এগুলো থাকা স্বাভাবিক। এগুলো আছে বলে সে বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ-নির্ভর উপাত্ত ও ব্যাখ্যাসমূহ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে না। এ তত্ত্বের ঘোরতর বিরোধীদের মূল যুক্তি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উপরোক্ত বিষয়গুলো কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ না হলেও, যেসব বিষয়ের ভিত্তিতে বিতর্কের টেবিলে ঝড় ওঠে সেগুলোকে গুরুত্ব দিতেই হয়। অতএব, প্রধানত যে তিনটি বিষয় আমাদের এই আলোচনায় গুরুত্ব পাবে, সেগুলো হচ্ছে— ক. জৈববিবর্তন তত্ত্বের ক্ষেত্রে আপত্তিসমূহ (Objections), খ. বিভিন্ন বিরুদ্ধ যুক্তি (arguments), এবং গ. এ তত্ত্ব যেসব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করতে পারেনি (major unsolved problems)।

জৈববিবর্তনের তত্ত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে যে দার্শনিক ও পদ্ধতিগত সংকট রয়েছে, সে আলোচনাও এখানে প্রাসঙ্গিক। এ বিষয়ে 'জৈববিবর্তনবাদ পাঠের দার্শনিক প্রস্তুতি' প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

ক. বিবর্তনবাদ নিয়ে আপত্তি ও বিরুদ্ধ যুক্তি

সত্য ঘটনা নয়, কেবল একটি মতবাদ মাত্র!

জৈববিবর্তন সম্পর্কে এর বিরোধীগণ দাবি করে থাকেন যে, "এটি কোনো সত্য ঘটনা নয়, এটি কয়েকজন ব্যক্তির প্রস্তাবিত একটি মতবাদ বা অনুমান। এটি যে সত্য তার পক্ষে তেমন কোনো প্রমাণ নেই।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবের বিবর্তন সম্পর্কিত ধারণাটি প্রকৃতিবিজ্ঞানের বহু শাখার হাজার হাজার গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের এই শাখাগুলো হচ্ছে— ভূতত্ত্ব (Geology), ফসিল বিজ্ঞান (Paleontology), উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, বংশগতি বিদ্যা (Genetics), তুলনামূলক অ্যানাটমি (Comparative Anatomy), তুলনামূলক শারীরবিদ্যা, তুলনামূলক ভ্রূণতত্ত্ব ইত্যাদি। অতএব এই বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও জৈববিবর্তন যে ঘটছে এবং মোটামুটি কি প্রক্রিয়ায় ঘটছে তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

ডারউইন প্রথম যৌক্তিকভাবে জৈববিবর্তনের তত্ত্বের প্রস্তাবনা করলেও আধুনিক জৈববিবর্তনের সংশ্লেষিত তত্ত্ব (Modern Synthesis of Evolution) ডারউইনের সময় থেকে শতগুণ বেশি সমৃদ্ধ। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অগ্রগতি জৈববিবর্তনের তত্ত্বকে আরো সুনির্দিষ্ট ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছে। একই পূর্বপুরুষ (প্রাক-প্রজাতি) থেকে বিবর্তিত হবার কারণেই যে প্রজাতিগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সমন্বিত গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত নানা তথ্য ও উপাত্ত এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর ফলে জৈববিবর্তন আজ মহাকর্ষের মতোই একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব নিয়ে যতই বিতর্ক হোক, মহাকর্ষ একটি বাস্তবতা

তেমনি বিবর্তনের তত্ত্ব নিয়ে যতই বিতর্ক হোক, জৈববিবর্তন যে ঘটছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ বিষয়ে অজ্ঞতার কারণেই অনেকে মনে করেন এটি একজন ব্যক্তির প্রস্তাবিত জীব সৃষ্টি সম্পর্কিত একটি প্রস্তাবনা যা পরবর্তীতে কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয়নি বা পরিপুষ্ট হয়নি। অনেকে মনে করেন এটি বিমূর্ত একটি দার্শনিক বিতর্ক, যা "আরাম কেদারায় বসা দার্শনিক ও যুক্তিবিদদের উর্বর মস্তিষ্কের সৃষ্টি"। প্রকৃত সত্য আসলে এর বিপরীত, বিবর্তনের প্রবক্তাগণের প্রত্যেকেই ছিলেন পরিশ্রমী প্রকৃতিবিদ এবং প্রকৃতির নিবিড় পর্যবেক্ষক। তাদের মধ্যে কেউই আগের থেকে জৈববিবর্তনের ধারণাকে গ্রহণ করেননি বরং প্রকৃতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই তারা এমন একটি ব্যাখ্যায় উপনীত হন।

যদি জৈববিবর্তনবাদ জীবের উৎপত্তির বিভিন্ন ব্যাখ্যার অন্যতম একটি হয়ে থাকে, তাহলে জীবের উৎপত্তির অন্যান্য ব্যাখ্যাগুলো কি কি? বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর বিকল্প কোনো মতবাদ নেই। যদি ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বকে আমরা এর বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করি তা আমাদের অনুসন্ধিৎসু মনকে পরিতৃপ্ত করতে পারবে কি? কখনোই না। কারণ— জীবের উৎপত্তি সম্পর্কে মানুষের মনে যেসব প্রশ্ন রয়েছে (যেমন, জীবের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে? কেন এত জীব বিলুপ্ত হয়েছে? প্রজাতিগুলোর মধ্যে বাহ্যিক ও বংশগত এত সাদৃশ্য কেন?) তার জবাবে যদি আমরা বলি 'সবকিছুর কারণ ঈশ্বর এবং তার ইচ্ছা', তাহলে আমাদের সকল অনুসন্ধিৎসার অপমৃত্যু ঘটে। কারণ, এটা এমন এক উত্তর যা সকল প্রশ্নকেই থামিয়ে দেয়।

যাঁরা বলেন বিবর্তনবাদ কেবল একটি মতবাদ (theory), তাঁরা ইংরেজি Theory শব্দের বিভিন্ন শাব্দিক অর্থের সাথে গুলিয়ে এক ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে থাকেন। অক্সফোর্ড ডিক্সনারিতে Theory শব্দের ছয়টি অর্থ দেয়া হয়েছে, এগুলো হচ্ছে— Hypothesis (প্রকল্প), Speculation (অনুমান), Conjecture (অনুমিতি), an idea (ধারণা), set of ideas (ধারণাগুচ্ছ) এবং an individual view of notion (একটি ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি বা অভিমত)। এসব অর্থের সাথে মেলালে মনে হয় এটি (Theory) অস্পষ্ট কোনো ভাবনা। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে Theory বলতে বোঝায়— "পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে বা জানা আছে এমন কোনো বিষয়ের সাধারণ সূত্র (general law), নিয়ম-নীতি (principles) অথবা কারণসমূহের বিষদ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা।"

অতএব, জৈববিবর্তনের তত্ত্ব বলতে আমরা শুধু সেই প্রস্তাবনা বা প্রকল্প (hypothesis)কে বুঝি না যে, 'জীব বিবর্তিত হয়' অথবা 'প্রাকৃতিক নির্বাচনই জৈববিবর্তনের প্রধান প্রক্রিয়া' (major mechanism)। এই তত্ত্ব আমাদের সামনে তুলে ধরে জৈব বৈচিত্র্যের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে বা জীবের ভৌগোলিক বিন্যাস কিভাবে ঘটেছে, সেসব প্রক্রিয়ার পরস্পর সম্পর্কিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা (যেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই গাণিতিকভাবে প্রকাশিত এবং ফসিল বিজ্ঞান, জৈব শ্রেণীবিন্যাস এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের অসংখ্য নিদর্শনের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে)। জৈববিবর্তনের সত্য উপলব্ধির উৎপত্তি হয়েছে যেসব ক্ষেত্রের পর্যবেক্ষণ থেকে তার মধ্যে রয়েছে— জীবসমূহের অঙ্গসংস্থানের (anatomical) সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য,

তাদের ভৌগোলিক বিন্যাস, শরীরের বিপাক ক্রিয়া (metabolic pathways), ভ্রূণতাত্ত্বিক বিকাশের ধাপসমূহ, ফসিলসমূহ, জিন, ক্রোমজম এবং আণবিক গঠনগত বৈশিষ্ট্যসমূহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ইত্যাদি। এই সকল ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা জৈববিবর্তনের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি। শুধু তাই নয়, আমরা আরো বুঝতে পারি যে "জীববিজ্ঞানে কোনো কিছুই অর্থবহ হয় না জৈববিবর্তনের আলো ছাড়া" (Dobzhanski, 1973)। বিখ্যাত বংশগতি বিজ্ঞানী ডবঝনস্কি একথা বলেছিলেন। কারণ, জৈববিবর্তনের তত্ত্বই জীববিজ্ঞানের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা (সময়ের সাথে সাথে জীবের বংশগতির পরিবর্তন) সম্পর্কে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। যেসব প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে জৈববিবর্তনের ব্যাখ্যা ছাড়া পরিপূর্ণভাবে বোঝা যায় না তার মধ্যে রয়েছে জিনের পরিবর্তন (mutation), জিনের প্রবাহ (genetic drift), প্রাকৃতিক নির্বাচন (selection), জীবের অভিপ্রয়াণ (migration), জীবের প্রতিবেশ (habitat), জীবের পরিবেশগত ভারসাম্য, জীবের অবলুপ্তি (extinction) ইত্যাদি। আধুনিক প্রায়োগিক জীববিজ্ঞানসমূহের (applied biological sciences) বহু প্রশ্নের সমাধান করা হয়েছে জৈববিবর্তনের তত্ত্বের ভিত্তিতে। জৈববিবর্তন যে ঘটেছে তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য। জৈববিবর্তনের তত্ত্বকে 'Theory' বলার কারণে যদি ভুল বোঝাবুঝির ঝুঁকি থাকে তাহলে একে জৈববিবর্তনের সূত্র (Evolutionary laws) নামেও অভিহিত করা যায় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন জীববিজ্ঞানীরা।

মধ্যবর্তী বা সংযোগকারী প্রজাতিসমূহ (Transitional Forms) নেই কেন?

যেহেতু অনেক জীবের ক্ষেত্রেই এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতি উৎপত্তির প্রতিটি ধাপে নিদর্শন নেই বিবর্তনবিরোধীরা এর ভিত্তিতে দাবি করেন 'বিবর্তন ঘটেছে তার প্রমাণ নেই'। কিন্তু বহু জীবের ক্ষেত্রেই মধ্যবর্তী স্তরগুলোর নিদর্শন পাওয়া গেছে। অসংখ্য এসব নিদর্শন থেকে কয়েকটি আমরা উল্লেখ করতে পারি—

ক. দক্ষিণ আফ্রিকার কারু এলাকায় বেশকিছু স্তন্যপায়ী প্রাণী সদৃশ সরীসৃপ প্রাণী পাওয়া গেছে, যাদের অঙ্গসংস্থান সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মাঝামাঝি।

খ. আর্কিওপটেরাসের বিখ্যাত ফসিলের কথা আমরা জানি। এ প্রাণীটির, পাখির মতো পাখা, পালক, নখর ও দাঁত কিন্তু গিরগিটির মতো কংকাল দেখে মনে হয় এটি সরীসৃপ ও পাখিদের মধ্যবর্তী কোনো প্রাণী।

গ. জীবন্ত প্রাণীদের মধ্যেও মধ্যবর্তী পর্যায়ের বহু নিদর্শন রয়েছে। যেমন প্লাটিপাস স্তন্যপায়ী হলেও ডিম পাড়ে

মধ্যবর্তী পর্যায়ের ফসিল (Transitional Fossil) অপেক্ষাকৃত কম পাওয়া যায়। এর কারণ হচ্ছে, অধিকাংশ প্রজাতির মূল জনগোষ্ঠী বেশির ভাগ সময়ব্যাপী সুস্থিত অবস্থায় (stable) থাকে। প্রজাতিগত পরিবর্তন ঘটে মূল জনগোষ্ঠী থেকে প্রজননগতভাবে বিচ্ছিন্ন (isolated) জনগোষ্ঠীতে এবং সুস্থিত অবস্থানের চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক কম সময় ধরে। এ বিষয়টিকে অনেকে তুলনা করেন বহুতল

বিশিষ্ট একটি কার পার্কিংয়ের দালানের সাথে। যেখানে বেশিরভাগ গাড়িকে দেখা যাবে বিভিন্ন ফ্লোরে এবং অল্পকিছু সংখ্যক গাড়িকে দেখা যাবে ঢালু র‍্যাম্প দিয়ে ওঠানামা করতে।

প্রজাতিসমূহের ভৌগোলিক বিস্তারের মধ্যেও এদের ক্রমপরিবর্তনের নিদর্শন রয়েছে যেমন ডারউইন গ্যালাপোগোস দ্বীপপুঞ্জে পাখি, গিরগিটি, কচ্ছপ ইত্যাদি প্রাণীদের মধ্যে দেখতে পান। এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে দেখতে পান একটি প্রজাতির সামান্য পরিবর্তিত একটি রূপ (ভিন্ন প্রজাতি)।

প্রকৃতপক্ষে ফসিল বিজ্ঞানীগণ নিশ্চিতভাবে হাজার হাজার মধ্যবর্তী ফসিল আবিষ্কার করেছেন। যেমন মাছ ও উভচরের মধ্যবর্তী ফসিল, সরীসৃপ ও পাখি এবং সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যবর্তী প্রজাতির ফসিলসমূহ। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে শত শত প্রজাতির উদাহরণ দেয়া যেতে পারে যার মধ্যে রয়েছে শৈবাল, প্রবাল থেকে শুরু করে বহুসংখ্যক অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীসমূহ। সব মধ্যবর্তী ফসিল ফসিল-বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে পারেননি একথা ঠিক কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সেরকম প্রজাতির অস্তিত্ব ছিল না। খুব অল্প সংখ্যক মৃত প্রাণীর দেহাবশেষ প্রকৃতিতে ফসিল হিসেবে সংরক্ষিত হয় এবং তার মধ্যে মধ্যবর্তী ফসিলগুলোর সংখ্যা আরো কম। এমনকি সংরক্ষিত অধিকাংশ ফসিলই পাথরের সাথে এমনভাবে মিশে যায় যে বিজ্ঞানীদের পক্ষেও তাদেরকে উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে অনুপস্থিতি সবসময় অস্তিত্বহীনতার নিদর্শন নয়। রাতে সূর্য দেখা যায় না, এর অর্থ এই নয় যে সন্ধ্যায় সূর্য গায়েব হয়ে যায় এবং সকালে পুনর্জন্ম লাভ করে।

'নিদর্শন আছে, প্রমাণ কই?'

বিবর্তনের তত্ত্বের বিরোধীরা প্রায়ই বলে থাকেন "জৈববিবর্তনের অনেক নিদর্শন আছে কিন্তু কোনো 'চাক্ষুষ প্রমাণ' নেই।" ভূতত্ত্ব (Geology), জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) ইত্যাদির মতো বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞানও একটি ইতিহাস-নির্ভর বিজ্ঞান (Historical Science)। অতীতের ঘটনা বলে, এ ধরনের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ নির্ভর কোনো প্রকল্পকে (hypothesis) পরিপূর্ণভাবে যাচাই করা যায় না। তবে তার মানে এই নয় এই সকল বিজ্ঞানে সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। অন্যান্য বিজ্ঞানে যেভাবে কোনো ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা হয়, ঐতিহাসিক বা অতীতের ঘটনাকে আমরা একইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি যদি তা পর্যবেক্ষণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

অতীতের হাইপোথিসিস যে যাচাই করা যায় তা এ বইয়ের অন্যত্র বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'ইতিহাস-নির্ভর' বিজ্ঞানসমূহে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যাদির মতো প্রথমেই একটি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয় না বরং একটি নির্দিষ্ট ঘটনাকে বোঝার ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। অতীতের ঘটনার অসংখ্য নিদর্শন এবং তার সাথে বর্তমানের তথ্যাবলীর সমন্বয় ঘটিয়ে জীবের ইতিহাসকে উন্মোচিত করে থাকে বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞান। একইভাবে কাজ করে অন্যান্য ইতিহাস-নির্ভর বিজ্ঞান।

ডারউইন নিজেও কখনো ভাবেননি যে, অতীতের কোনো ঘটনাকে সরাসরি প্রমাণ

করা যায়। বিজ্ঞানের পদ্ধতিগত ও দার্শনিক বিষয়গুলোর ওপর তাঁর চিন্তা ও উপলব্ধি ছিল অত্যন্ত গভীর। এক বন্ধুর কাছে তিনি লিখেছিলেন— "প্রজাতির পরিবর্তন যে ঘটছে তা সরাসরি প্রমাণ করা সম্ভব নয়।... এবং... বিশ্বাসের উত্থান-পতন সেভাবেই ঘটে যেভাবে (ধারণাগুলো) দানা বাঁধে বা যেভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো খুব কম সংখ্যক লোকই বিষয়টিকে এভাবে বিচার করে।"

জৈববিবর্তনের তত্ত্ব এবং অন্যান্য ইতিহাস-নির্ভর বিজ্ঞানের যত সীমাবদ্ধতাই থাক, অতীতকে জানার যে কৌতূহল ও প্রয়োজনীয়তা মানুষের রয়েছে তার প্রশমনের জন্য এর কোনো বিকল্প নেই। আশার কথা হলো, সময়ের সাথে সাথে বিজ্ঞানের এ সকল শাখা তাদের সীমাবদ্ধতা এবং অস্পষ্টতা কাটিয়ে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলেছে এবং অতীত সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা তুলে ধরতে পারছে মানুষের সামনে।

জৈববিবর্তন তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা এবং অনেক অমীমাংসিত প্রশ্ন

বিরোধিতাকারীরা প্রায়ই অভিযোগ করেন, জৈববিবর্তনের তত্ত্ব অনেক প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারে না, ব্যাখ্যা দিতে পারে না। একথা ঠিক। এটি বিজ্ঞানের যে কোনো শাখার জন্যই স্বাভাবিক। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় এরকম বহু অমীমাংসিত প্রশ্ন রয়েছে। কোনো একটি শাখায় অমীমাংসিত প্রশ্নের সংখ্যা বেশি হলেও সত্যে উপনীত হবার স্বার্থে সেই বিজ্ঞানকে গ্রহণ না করে আমাদের কোনো উপায় নেই। টি.এইচ. হাক্সলি একবার তার ছাত্রদের বলেছিলেন— 'ধরো তুমি গভীর অন্ধকার রাতে কোনো গ্রামের পথে হারিয়ে গেলে, যেখানে রাস্তার কোনো চিহ্নই নেই। কেউ যদি তোমাকে টিমটিমে একটি লণ্ঠন দেয় তুমি কি তা এই বলে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে যে ওটা নিখুঁত আলো দিচ্ছে না?'

যারা বিরোধিতা করেন তাদের কাছে এর কোনো বিজ্ঞানসম্মত বিকল্প নেই। তাদের আছে বিশ্বাস, যা বিজ্ঞান নয়। কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা প্রমাণ ছাড়াই তা তারা গ্রহণ করেন অর্থাৎ তারা 'যুক্তি পেয়েছেন বলে বিশ্বাস করেন' তা নয় বরং 'বিশ্বাস করেন বলেই যুক্তি জুটিয়ে আনেন।'

বংশগতি বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় জৈববিবর্তন?

ডারউইনের সময় বংশগতি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ছিল খুব সীমিত। এ ব্যাপারটি নিয়ে তিনি বেশ অস্বস্তিতে ভুগতেন। কারণ তার তত্ত্বে জীবের যে পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে তা হলো প্রজন্মান্তরে সঞ্চারণশীল পরিবর্তন (Heritable Change)। জীবের বংশগতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকেও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি ডারউইন। পরবর্তীকালে যখন মেন্ডেল এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার বংশগতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার জন্ম দেয়, তখন অনেকেই বলতে থাকেন— 'জৈববিবর্তনের তত্ত্ব বংশগতির আধুনিক ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়'। আসলে ব্যাপারটা এর উল্টো।

জৈববিবর্তন যেসব পর্যবেক্ষণের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে প্রথমটি হলো, একটি জনগোষ্ঠীতে বিভিন্ন সত্তার মধ্যে পরিবর্তন বা বৈচিত্র্য সৃষ্টি হওয়া। যে পরিবর্তিত

বৈশিষ্ট্য পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়)। এ ক্ষেত্রে যে প্রশ্নগুলোর সমাধান ডারউইন করতে পারেননি সেগুলো ছিল—

ক. প্রজন্মান্তরে সঞ্চরণশীল বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন কিভাবে হয়?
খ. পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্য কিভাবে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়?
গ. পরবর্তী প্রজন্মে, বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে কি সংমিশ্রণ (Blending) ঘটে?
ঘ. প্রজন্মান্তরে জনগোষ্ঠীর ওপর এই পরিবর্তনের ফলাফল কি দাঁড়ায়?

বংশগতি বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এই প্রশ্নগুলির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই ব্যাখ্যা বিবর্তনের পদ্ধতি সম্পর্কে যে অস্পষ্ট ধারণা ছিল তা অনেকটাই দূর করতে সক্ষম হয়। বংশগত বৈশিষ্ট্যের একক (unit), জিন (Gene) আবিষ্কার হবার পর জৈববিবর্তনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হয়। বিবর্তনের প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত এই সর্বশেষ ব্যাখ্যা ডারউইনের প্রস্তাবনা এবং ব্যাখ্যার বিরোধী নয় বরং তার পরিপূরক। এ বিষয়টির বিস্তৃত বর্ণনা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। বংশগতির ধারণার ওপর ভিত্তি করে জৈববিবর্তনের প্রক্রিয়াকে সংক্ষেপে বলা হয়— 'Gene mutates, individual organism is selected and Species evolves' অর্থাৎ, পরিবর্তন হয় মূলত জিনের ক্ষেত্রে যাকে বংশগতির ভাষায় বলা হয় মিউটেশন। মিউটেশনের ফলে যে সকল সত্তা উপযোগী বৈশিষ্ট্য (favourable trait) অর্জন করে তারা প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত হয়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের এই প্রক্রিয়া, (বহু প্রজন্মব্যাপী ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে) প্রজাতির কোনো একটি জনগোষ্ঠীর সার্বিক পরিবর্তন ঘটাতে পারলেই সেই জনগোষ্ঠী নতুন প্রজাতিতে পরিণত হতে পারে (যদি পরিবর্তনের মাত্রা এতটাই বেশি হয় যে তার ফলে ওই জনগোষ্ঠী মূল জনগোষ্ঠী থেকে প্রজননগতভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে)। আধুনিক বংশগতি বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা Population Genetics জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই পরিবর্তনের গতি প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করে।

বংশগতিবিদ্যা বিবর্তনের আধুনিক ব্যাখ্যার অন্যতম ভিত্তি। ডারউইনের বিবর্তনবাদ এবং বংশগতিবিদ্যার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষ (The Modern Synthesis of Evolution)। অতএব জৈববিবর্তনের তত্ত্ব বংশগতি বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এ কথার কোনো ভিত্তি নেই।

'যোগ্যতমের টিকে থাকা' নিয়ে বিভ্রান্তি

প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বে দেখানো হয়েছে একটি প্রাকৃতিক প্রতিবেশে জীবের মধ্যে ব্যাপক টিকে থাকার সংগ্রাম থাকে। এর ফলে প্রতিযোগিতাকারী সত্তাগুলোর (individual) মধ্য থেকে শুধু যোগ্যতম অংশই টিকে থাকতে পারে। সমালোচনাকারীরা যুক্তি দেখান— "শুধু যোগ্যতমই টিকে থাকবে" এই প্রস্তাবনা যাচাইয়ের অযোগ্য হয়ে যায় যোগ্যতার একটি সুষম সংজ্ঞা ছাড়া। কিন্তু টিকে থাকার যোগ্যতা কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয় নয়, তা একেক পরিস্থিতিতে একেক রকম। এর কোনো সুষম সংজ্ঞা হয় না। প্রতিটি জীবের ক্ষেত্রে একে ব্যাখ্যা করা যায় কেবল ওই নির্দিষ্ট জীবের জীবন ইতিহাস দিয়ে। সবুজ রঙ একটি ভৌত বৈশিষ্ট্য, এটি গাছের

পাতাকে একরকম সুবিধা দেয় (সালোক সংশ্লেষণে সাহায্য করে) কিন্তু একটি পোকাকে দেয় অন্যরকম সুবিধা (সংহারকারীর হাত থেকে বাঁচায়)।

ডারউইন-ওয়ালেস তত্ত্বের মূল বিষয়টি অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব এবং যোগ্যতমের টিকে থাকার ব্যাপারটি নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ নেই কারণ জীব-জগতের যেসব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এই ধারণার উন্মেষ ঘটেছে সেগুলো ছিল নির্ভুল। এগুলো হলো—

ক. প্রতিটি জীবের অতিরিক্ত সংখ্যক সন্তান উৎপাদন

খ. প্রতিটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন বংশগত বৈচিত্র্যের (genetic variability) উপস্থিতি

গ. প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি বাছাই করার প্রক্রিয়ার উপস্থিতি যা প্রজাতির বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর দীর্ঘমেয়াদি স্থিতি এবং ঘটনাক্রমিক (episodic) বিচ্যুতি (diversification) ঘটিয়ে থাকে।

এগুলো শুধু ইতিহাস, বিজ্ঞান নয়—

জৈববিবর্তনের অতীত নির্ভর ব্যাখ্যা ও বর্ণনাকে অনেকেই ইতিহাসের সাথে তুলনা করেন এবং বলেন, এগুলো 'বিজ্ঞান নয়'। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যাদির সাথে তুলনা করে তারা ভাবেন বিজ্ঞান মানে হচ্ছে কিছু সূত্র এবং 'ফর্মুলা' আবিষ্কার করা। কিন্তু আমরা আগেও আলোচনা করেছি বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞান এবং অন্যান্য ইতিহাস-নির্ভর বিজ্ঞানসমূহের কর্মধারা ভৌতবিজ্ঞানসমূহের মতো নয়। এছাড়া ইতিহাস মানে গাল-গল্প এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ব্যাপক অর্থে ইতিহাসও এক ধরনের বিজ্ঞান কারণ এখানে অতীতের নিদর্শনের ভিত্তিতে যৌক্তিকভাবে সত্যে উপনীত হতে হয়।

অনেক সময় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের ব্যক্তিরাও জৈববিবর্তনের তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে থাকেন এই বিবেচনায় যে, এটি ধর্মীয় বিশ্বাসের মতোই একটি বিশ্বাস। কিন্তু এর থেকে এমন মারাত্মক ভুল হতে পারে যাতে মানুষের প্রাণহানি ঘটাও বিচিত্র নয়। ১৯৮৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লোমা লিন্ডা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল স্কুলের চিকিৎসক লিওনার্ড বেইলি একটি বাচ্চার অসুস্থ হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ নেন। তিনি শিশুটির দেহে বেবুনের হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন করেন। অঙ্গটি তার শরীর কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় বাচ্চাটি মারা যায়। যেহেতু বিবর্তনের তত্ত্ব এবং বংশগতি বিদ্যার তথ্য অনুযায়ী আমরা জানি শিম্পাঞ্জী মানুষের আরো কাছাকাছি প্রাণী। শিম্পাঞ্জীর হার্ট লাগানো হলে প্রত্যাখ্যানের সম্ভাবনা কম ছিল তবু কেন তিনি বেবুনের হার্ট ব্যবহার করলেন, এ কথার জবাবে ডা. বেইলি বলেন, তিনি "জৈববিবর্তন বিশ্বাস করেন না"।

জটিল জীব এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কি কোনো সচেতন পরিকল্পনা ছাড়া হতে পারে?

মানুষের সহজ কাণ্ডজ্ঞান এবং চিন্তার ধরন তাকে অতিপ্রাকৃত পরিকল্পনার পক্ষে নিয়ে যায়। বিশেষত যখন সে প্রকৃতিতে কোনো জটিল প্রপঞ্চের সম্মুখীন হয়। তাদের মনে যে ধরনের প্রশ্ন জেগে ওঠে তা হলো— 'ঘড়ির প্রস্তুতকারক ছাড়া কি ঘড়ি হতে পারে?'

কিংবা "সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কি মানুষ হতে পারে?" অথবা "প্রকৃতিতে জীবের যথেচ্ছ (random) পরিবর্তন থেকে কি করে জীবের সুসংগঠিত শারীরবৃত্ত গড়ে উঠল?" প্রকৃতপক্ষে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে কিভাবে যথেচ্ছ পরিবর্তনের বিশৃঙ্খলা থেকে সংগঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং শারীরিক প্রক্রিয়া (কোনো নিয়ন্ত্রক ছাড়াই) গড়ে উঠতে পারে। প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করেই ঐ সকল প্রশ্নের জবাব খুঁজে পান ডারউইন এবং ওয়ালেস। তাঁরা দেখতে পান অভিযোজনের মাধ্যমে এই ব্যাপারটি ঘটে। যে সকল পরিবর্তন অভিযোজনের উপযোগী সেসব বৈশিষ্ট্য টিকে থাকছে অর্থাৎ যেসব বৈশিষ্ট্য অর্জনকারী সত্তা (individual) টিকে থাকছে এবং যেগুলো অভিযোজনের উপযোগী নয় সেসব বৈশিষ্ট্য অর্জনকারী সত্তা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বা টিকে থাকতে পারছে না। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলে কয়েক প্রজন্ম পরে অঙ্গ সংস্থান ও শারীরবৃত্তের ভিন্ন একটি সংগঠিত রূপ সৃষ্টি হতে পারে।

অনেকেই প্রশ্ন করেন, দৈবাৎ (By chance) এরকম একটি ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কতটুকু? এর জবাবে বিবর্তনবাদীরা বলেন, বিবর্তন ধাপে ধাপে হয়। কোনো জটিল অঙ্গ একবারে বিবর্তিত হয়নি। একেকটি ধাপ একেকবারে বিবর্তিত হয়। প্রকৃতিতে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে এর নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন চোখ, কান ইত্যাদি জটিল অঙ্গ যে ধাপে ধাপে বিবর্তিত হয়েছে তার নিদর্শন প্রকৃতিতে রয়েছে। সম্ভাব্যতার সূত্র অনুযায়ী অনেকেই বলেন, এরকম ঘটনার সম্ভাবনা খুব কম। এটা সত্য যদি আমরা ঘটনাটিকে সম্পূর্ণ যথেচ্ছ (random) বলে ধরে নিই। কিন্তু এটি যদি অভিযোজনের (Adaptation) মাধ্যমে ঘটে তাহলে এরকম ঘটনার সম্ভাবনা খুব বেশি।

উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক, আমরা একটা বড় পাত্রে দশটি ইংরেজি অক্ষর নিলাম (A, C, E, I, L, N, O, T, U, V) যেখানে প্রতিটি অক্ষরই বহু সংখ্যক এবং একই পরিমাণে রয়েছে। আমরা যদি ৯টি অক্ষর যথেচ্ছভাবে তুলে সাজাতে থাকি তার থেকে EVOLUTION শব্দটি তৈরি হবার হবার সম্ভাবনা 1×10^9 অর্থাৎ একশ' কোটিতে একবার। অর্থাৎ খুবই বিরল সম্ভাবনা।

কিন্তু এক্ষেত্রে যদি নির্বাচনের (selective) কোনো প্রক্রিয়া থাকে তাহলে এই চিত্রটি পাল্টে যাবে। মনে করি 'E' একমাত্র অক্ষর যা এককভাবে টিকে থাকতে পারবে। তাহলে যথেচ্ছভাবে তুললেও গড়ে E উঠানোর সংখ্যা হবে $^1/_{10}$ বা দশবারে একবার। এখন যদি এমন হয়— EV সমন্বয়ে টিকে থাকার ক্ষেত্রে আরো কিছু সুবিধা (advantage) রয়েছে; যে ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট EV সমন্বয় সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা হবে $^1/_{10}$ অর্থাৎ দশটিতে একটি। এখানে লক্ষণীয় যে, যেহেতু E আগে থেকেই টিকে আছে সেহেতু এখানে V যুক্ত হবার সম্ভাবনা $^1/_{100}$ নয়, $^1/_{10}$। (যদি দুটি অক্ষরের একই সাথে টিকে থাকার সুবিধা থাকতো তাহলে EV সমন্বয় হবার সম্ভাবনা হতো $^1/_{100}$)। একইভাবে পর্যায়ক্রমে অভিযোজনের মাধ্যমে যদি O, L, U, T, I, O, N ইত্যাদি অক্ষর চলে আসে সে ক্ষেত্রেও কোনো সচেতন নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই EVOLUTION শব্দটি তৈরি হবার সম্ভাব্যতা থাকবে অনেক বেশি।

জৈববিবর্তনের ঘটনাগুলো দৈবাৎ ঘটছে একথা বলা যায় না। কারণ এভাবে যে ঘটনা ঘটে তার কোনো পরম্পরা থাকে না। জৈববিবর্তনের ঘটনা পরম্পরায় ঘটে

বাছাইকরণটি নির্বাচিত হলে একটি জটিল সমাবেশের সম্ভাব্যতাও অনেক বেড়ে যায়।

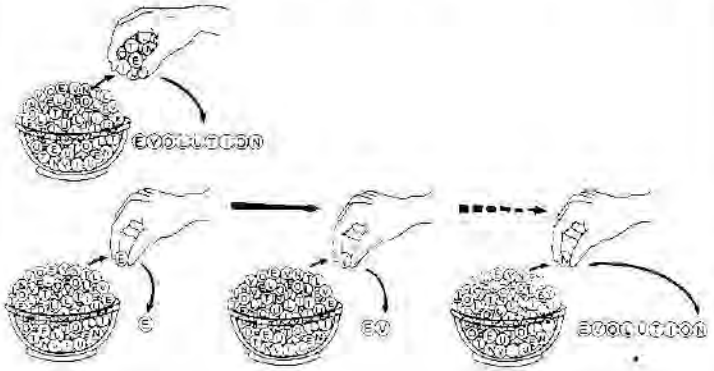

তিমির বিবর্তনের মধ্যবর্তী ফসিল

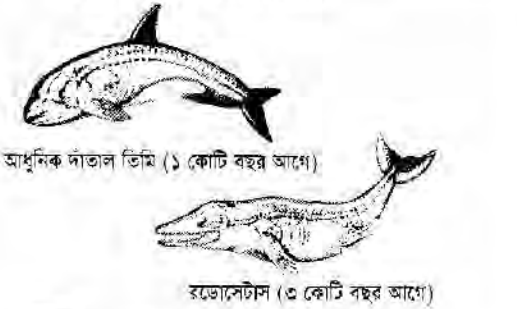

আধুনিক দাঁতাল তিমি (১ কোটি বছর আগে)

রডোসেটাস (৩ কোটি বছর আগে)

অ্যামবুলোসেটাস (৫ - ৪ কোটি বছর আগে)

সিনোনিক্স (৬ কোটি বছর আগে)

থাকে। কোনো একটি ঘটনা তার আগের ঘটনার ওপর নির্ভরশীল বা সম্পর্কিত, যার ফলে একটি সংগঠিত জটিল সমন্বয়ের জন্ম দিতে পারে।

প্রাকৃতিক নির্বাচন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা পৃথক পৃথকভাবে ঘটে যাওয়া দৈবাৎ ঘটনাগুলোকে 'সৃষ্টিশীল' পরম্পরায় সাজাতে পারে কারণ এই প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট ধাপগুলো অভিযোজনমূলক (Adaptive), যা টিকে থাকতে পেরেছিল। অভিযোজন কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয় বরং অধারাবাহিক অনেকগুলো ধারাবাহিক নির্বাচনের ফলশ্রুতি। অর্থাৎ উন্নত দৃষ্টির জন্য ধারাবাহিক নির্বাচনের মাধ্যমেই জন্ম নিয়েছে উন্নত দেখার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। উন্নত (মেরুদণ্ডীয়) কাঠামোর জন্য নির্বাচন উন্নত মেরুদণ্ডের জন্ম দিয়েছে এবং উন্নত শোনার জন্য ধারাবাহিক নির্বাচন উন্নত শ্রবণ যন্ত্রের জন্ম দিয়েছে।

খ. জৈব বিবর্তনের "রহস্যময় অংশ" বা অমীমাংসিত সমস্যাবলী (Major Unsolved Problems)

বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার মতো বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু সমস্যা আছে যা এখনো পরিপূর্ণভাবে মীমাংসা হয়নি। বিজ্ঞানের যে কোনো শাখার জন্য এ ধরনের কিছু অমীমাংসিত প্রশ্ন এবং সমস্যা থাকা স্বাভাবিক হলেও বিরোধীরা এ সকল অমীমাংসিত সমস্যার কারণে এই তত্ত্বকে 'গ্রহণযোগ্য নয়' বলে চিহ্নিত করতে চান। তবে আশার কথা হলো, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞান যত বাড়ছে এই অমীমাংসিত সমস্যাগুলোর অস্পষ্টতা তত কমছে। অর্থাৎ অমীমাংসিত সমস্যাগুলো তত এগিয়ে যাচ্ছে সমাধানের দিকে। যেসব ক্ষেত্রে এখনো অস্পষ্টতা রয়েছে সেগুলো হলো— ১. জীবনের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে? ২. যৌনতার উৎপত্তি কিভাবে এবং কেন হয়েছে? ৩. ভাষার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে? ৪. জীবজগতের পর্বগুলোর (Phyla) উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে? ৫. ব্যাপক হারে প্রজাতিসমূহের বিলুপ্তির (mass extinction) কারণ কি? ৬. ডিএনএ (DNA) এবং Phenotype-এর সম্পর্ক কি? ৭. প্রাকৃতিক নির্বাচন কতটা ব্যাখ্যা করতে পারে?

জীবনের উৎপত্তি

আমরা জানি যে কেবল জীবন থেকেই জীবনের সৃষ্টি হতে পারে। তাহলে প্রশ্ন আসে জীবন প্রথমে কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল? অজৈব পদার্থ থেকে জীবনের উৎপত্তি কি একবারই ঘটেছিল না একাধিকবার? বর্তমানেও প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম পরিবেশে অজৈব উপাদান থেকে জীবনের উৎপত্তি ঘটা সম্ভব কি? এসব প্রশ্নের পরিপূর্ণ উত্তর দিতে না পারলেও আণবিক জীববিজ্ঞানের (Molecular Biology) ক্ষেত্রে উন্নতির ফলে এসব প্রশ্নের কিনারা করতে শুরু করেছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি হবার আগে জীবের উৎপত্তির জন্য প্রয়োজনীয় জৈব রাসায়নিক উপাদানগুলোর উৎপত্তি ঘটেছিল। উপযুক্ত শক্তির উৎস (energy source), রাসায়নিক উপাদানসমূহ (chemicals), উপযুক্ত দ্রাবক (solvent) এবং তাপমাত্রা এবং একটি বিজারক (reducing) বায়ুমণ্ডল ইত্যাদির সহ-অবস্থান তিনশ' কোটি বছর

আগে পৃথিবীতে ছিল। অতএব এ সময় জৈব যৌগ এবং জীবের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব ছিল।

১৯৫৩ সালে আমেরিকার রসায়নবিদ স্ট্যানলি মিলার ৩০০ কোটি বছর আগের পৃথিবীর অবস্থা কল্পনা করে একটি পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি মিথেন, অ্যামোনিয়া, পানি এবং হাইড্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণের মধ্যে বৈদ্যুতিক ছটা (Electric spark discharge) দিয়ে অ্যামাইনো এসিড উৎপন্ন করতে সক্ষম হন। জীবনের মৌলিক উপাদান নিউক্লিক এসিডের প্রধান উপাদান হলো অ্যামাইনো এসিড।

আণবিক জীববিজ্ঞান (Molecular Biology) বর্তমানে তার শৈশব অতিক্রম করছে। বিজ্ঞানের এই শাখার উন্নতির সাথে সাথে জীবনের উৎপত্তির রহস্যও আস্তে আস্তে কেটে যাবে। পৃথিবী বহির্ভূত কোনো উৎস থেকে জীবের উৎপত্তি হয়েছে বলেও অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন। জীবনের আদি উৎস পৃথিবীর বাইরে হলেও তা জৈববিবর্তনের বিরুদ্ধে যায় না।

যৌনতার উৎপত্তি

জীব-জগতে ব্যাপক অধিকাংশ প্রজাতির মধ্যে যৌনতা রয়েছে। অল্প কিছু প্রাণী অযৌন পদ্ধতিতে প্রজনন ক্রিয়া সম্পন্ন করে। জৈববিবর্তন বিরোধীরা বলেন যৌনতার উৎপত্তি কেন হয়েছে জৈববিবর্তন তার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। আবার এদের অনেকে যুক্তি দেখান— যেহেতু যৌনতার জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীকে 'যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়', অথচ জীবের টিকে থাকার ক্ষেত্রে এর কোনো ভূমিকা নেই। অতএব, এটি প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে এসেছে তা বলা যায় না। তাই যৌনতাকে তারা কোনো 'সচেতন প্রজ্ঞার পরিকল্পনা' বলে চিহ্নিত করতে চান।

কিন্তু আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, জটিল বহুকোষী প্রাণীর টিকে থাকার ক্ষেত্রে যৌন প্রজননের বিশেষ ভূমিকা আছে। জৈব বৈচিত্র্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও যৌন প্রজনন অযৌন প্রজননের চেয়ে উপযোগী। অতএব যৌন প্রজননের ব্যাপারটি প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমেই এসেছে সে ব্যাপারে জীববিজ্ঞানীরা মোটামুটি নিশ্চিত।

ভাষার উৎপত্তি

মানুষের ভাষা অত্যন্ত জটিল। জীবনবৃক্ষে মানুষের কাছাকাছি প্রাণীদের মধ্যে শুধু মানুষেরই ভাষা আছে। এই ব্যাপারটিকে অনেকে অতিপ্রাকৃত বলে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। ভাষা বোঝার ক্ষমতা এবং প্রকাশ করার ক্ষমতা মস্তিষ্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেসব প্রজাতির প্রাণীদের মস্তিষ্কের আকার মানুষের মস্তিষ্কের আকারের খুব কাছাকাছি ছিল তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তাদের ফসিল পাওয়া গেছে (যেমন— হোমো হ্যাবিলিস, হোমো ইরেকটাস ইত্যাদি)। এদের ক্ষেত্রে হয়তো মানুষের ভাষার চেয়ে সরল (Rudimentary) ভাষার অস্তিত্ব ছিল। শিম্পাঞ্জীর ওপর গবেষণায় দেখা গেছে প্রাণীটি প্রায় চারটি অর্থপূর্ণ শব্দ এবং অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করে (অন্যদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য)। শিম্পাঞ্জীর সাথে মানুষের মস্তিষ্কের কার্যকর আকারের পার্থক্য অনেক বেশি।

অতএব জীবিত প্রাণীদের মধ্যে শিম্পাঞ্জীর সাথে মানুষের বংশগতির মিল সবচেয়ে বেশি হলেও এত বিস্তর ভাষাগত পার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক।

পর্বের (Phyla) উৎপত্তি

জীব-জগতে জীবন্ত প্রাণীসমূহের যে পর্বগুলো রয়েছে এবং ফসিলের রেকর্ড অনুযায়ী অতীতে যে বিপুল সংখ্যক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে তাদের পর্বসমূহ, বর্তমান পর্বগুলোর সাথে তাদের সম্পর্ক এবং মধ্যবর্তী ফসিলসমূহ এরকম বহু ব্যাপারে জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে জ্ঞানের ঘাটতি এবং মতভেদ রয়েছে। এ বিষয়গুলো নির্ধারিত না হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই বিবর্তনের স্পষ্ট একটি চিত্র পাওয়া যায় না।

এ ব্যাপারটিকে অনেকেই এমনভাবে উপস্থাপন করেন যে, "জৈববিবর্তনের তত্ত্ব অস্পষ্ট, অনির্ধারিত এবং বিভ্রান্তিকর"। প্রকৃতপক্ষে এ সকল বিষয়ে যে অস্পষ্টতা রয়েছে তা জৈববিবর্তনের মূল তত্ত্বকে বোঝার ক্ষেত্রে কোনো বড় বাধা নয়। সময়ের সাথে সাথে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানের প্রসারের ফলে এ ধরনের অস্পষ্টতাও কমে যাচ্ছে।

ব্যাপক হারে প্রজাতির বিলুপ্তি (Mass extinction)

পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে হঠাৎ করে ব্যাপক হারে প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটছে। এ ধরনের ঘটনা কেন ঘটছে তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছে মতভেদ। এই মতভেদ যে বিষয় নিয়ে তা জৈববিবর্তনের মূল প্রতিপাদ্য নয়। এই বিতর্ক জৈববিবর্তনকে বুঝবার ক্ষেত্রেও কোনো বাধা নয়। ভূতত্ত্বের আধুনিক গবেষণায় ব্যাপক হারে প্রজাতির বিলুপ্তির বেশ কিছু কারণ চিহ্নিত হয়েছে যা আরো স্পষ্টভাবে বিবর্তনের তত্ত্বকে আমাদের সামনে তুলে ধরে।

ডিএনএ এবং Phenotype-এর সম্পর্ক

ডিএনএ জীবের বংশগতির ধারক এবং Phenotype তার প্রকাশিত রূপ। একসময় বংশগতি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ছিল সীমাবদ্ধ। সে সময়ে জৈববিবর্তনের প্রক্রিয়া নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক ও মতভেদ ছিল। জৈববিবর্তন কি অল্প অল্প বংশগত পরিবর্তন থেকে হয় নাকি বড় ধরনের পরিবর্তনের মাধ্যমে হয় তা নিয়ে জীববিজ্ঞানীদের মধ্যেও বিতর্ক ছিল। ডারউইন নিজে অল্প অল্প এবং ধীর পরিবর্তনের পক্ষে ছিলেন। আধুনিক জৈববিবর্তন বিজ্ঞানীদের গবেষণায় ধীর এবং আকস্মিক বা বড় ধরনের পরিবর্তন উভয় প্রক্রিয়াকেই জৈববিবর্তনের কার্যকর প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে অর্থাৎ জৈববিবর্তনের প্রক্রিয়া নিয়ে বড় ধরনের কোনো বিতর্ক এখন আর নেই।

প্রাকৃতিক নির্বাচন কতটা ব্যাখ্যা করতে পারে?

জৈববিবর্তনের তত্ত্ব সমস্ত জীব ও জৈবনিক ক্রিয়ার উৎপত্তিকে প্রাকৃতিক নির্বাচন দিয়ে ব্যাখ্যা করে। একটি মাত্র প্রক্রিয়া দিয়ে সমস্ত জীব-জগতের পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা

যায় কি? এ প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। প্রকৃতপক্ষে ডারউইন নিজেও কখনো বলেননি যে প্রাকৃতিক নির্বাচন জৈববিবর্তনের একমাত্র প্রক্রিয়া। তিনি নিজেই আরেকটি প্রক্রিয়ার আবিষ্কার করেছিলেন, সেটি হচ্ছে যৌন নির্বাচন (Sexual selection)। তাঁর *Descent of Man* বইয়ে তিনি বিশদভাবে বিবর্তনের এই প্রক্রিয়াটির বর্ণনা করেছেন। জৈববিবর্তনের আরো কিছু প্রক্রিয়া পরবর্তীকালের বিজ্ঞানীরা প্রস্তাব করেছেন যার মধ্যে নিরপেক্ষ নির্বাচন বা Neutral Selection উল্লেখযোগ্য।

শেষ কথা

জৈববিবর্তনের তত্ত্বের ক্ষেত্রে যে আপত্তি (objections), বিরুদ্ধ যুক্তি এবং অমীমাংসিত বিষয়াবলী (Major Unsolved Problems) রয়েছে বিজ্ঞানের যে কোনো শাখার জন্য তা স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা এই তত্ত্বের পক্ষে ও বিপক্ষে মত পোষণ করেন তাঁদের অধিকাংশেরই এ বিষয়ে কোনো গভীর বা সুস্পষ্ট ধারণা নেই। দু'পক্ষ যখন বিতর্ক করেন তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের বিতর্কে বৈজ্ঞানিক যুক্তির চেয়ে আবেগই থাকে বেশি। উভয়পক্ষই তাঁদের অবস্থানকে শতকরা একশ' ভাগ 'সত্য' বা 'প্রমাণিত' বলে দেখাতে চান যা একেবারেই ঠিক নয়। দেখা যায়, যে প্রশ্নের উত্তর জৈববিবর্তনের তত্ত্ব দিতে পারছে না তা স্বীকার না করে জোড়াতালি দিয়ে সেই ফাঁক পূরণ করার চেষ্টা করছেন অনেকে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তথ্য ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে ফাঁক রয়েছে তাকে বানানো যুক্তি দিয়ে পূরণ করার চেষ্টা এবং বিরোধীদের এ সংক্রান্ত খোলামেলা প্রশ্নগুলোকে উড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিজ্ঞানের কোনো উপকার হয় না। বরং বিজ্ঞানের পক্ষাবলম্বন করতে গিয়ে কিছু মানুষ অবৈজ্ঞানিক চেতনায় আক্রান্ত হন। বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং সীমাবদ্ধতাগুলোকে আমাদের বৈজ্ঞানিকভাবেই মোকাবিলা করতে হবে। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় অপূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা আছে এবং থাকবে। তার মানে এই নয় ঐ বিষয়ে যা কিছু জানা গেছে বা প্রমাণিত হয়েছে তাকেও বাতিল করে দিতে হবে।

অজ্ঞতা ও সীমাবদ্ধতা স্বীকার করা বিজ্ঞানের প্রবণতা। এর মাধ্যমে বিজ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মের জন্য, উন্মোচন করার এবং আলোকিত করার ক্ষেত্র রেখে যায়। জৈববিবর্তনের তত্ত্বের বিরোধীদের প্রধান যুক্তি হলো এই তত্ত্ব শত ভাগ নিখুঁত নয়। এই যুক্তিতে বিজ্ঞানের কোনো শাখাকে বাতিল করা যায় না কারণ ঐ ক্ষেত্রের অন্ধকার পথটিতে অগ্রসর হবার একমাত্র বাতি হচ্ছে মানুষের অর্জিত জ্ঞান। অন্ধকার পথে ঐ বাতি নিখুঁত না হলেও ওটি ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। অর্থাৎ আমরা যদি জীবের উৎপত্তি, পরিবর্তন ও বিকাশ সম্পর্কে ধর্মীয় কল্পনানির্ভর ধারণায় সন্তুষ্ট না থেকে যৌক্তিক এবং পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে অগ্রসর হতে চাই জৈববিবর্তনের তবেই আমাদের একমাত্র পাথেয়।

জৈববিবর্তন পাঠের দার্শনিক প্রস্তুতি

জৈববিবর্তনের তত্ত্ব গ্রহণের দার্শনিক ও পদ্ধতিগত সংকট প্রসঙ্গে

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক টিভি চ্যানেলে কিছুদিন আগে একটি ভিন্নরকম প্রতিবেদন প্রচারিত হচ্ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা রাজ্যের জেফারসন হাইস্কুলের (ওপরের ক্লাসের) ছাত্রছাত্রীরা সম্মিলিতভাবে তাদের পাঠ্যসূচি থেকে একটি বিষয়কে বাদ দেবার জন্য এক ধরনের 'অসহযোগ' আন্দোলন করছে। যে বিষয়টির ওপর ঐ ছাত্ররা মারমুখী হয়েছে তা হলো বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞান (Evolutionary Biology)। ব্যাপারটি স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকদেরও বিব্রত করে। ছাত্রছাত্রীদের ধারণা, এ বিষয়টি পাঠ করলে তাদের 'ধর্মবিশ্বাস ক্ষতিগ্রস্ত হবে'। ঐ অনুষ্ঠানে ছাত্রদের বক্তব্য শোনানো হলো। সংক্ষেপে তাদের বক্তব্য ছিল— "বাইবেলের জেনেসিস অধ্যায়ে যেভাবে পৃথিবী ও জীবজগত সৃষ্টি হবার কথা বলা হয়েছে, জগত সৃষ্টির ব্যাপারে এর থেকে ভিন্ন কথা বলছে এমন মতবাদ আমরা মেনে নিতে পারি না।" খুব সাংঘাতিক কথা! বিজ্ঞানের কোনো শাখার অধ্যয়নের আগে যদি এই বিচার করতে হয় যে তা ধর্মগ্রন্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা ভিন্ন মতের কিনা, তা হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও মুক্তচিন্তা নানভাবে বাধাগ্রস্ত হবে এবং আবার একটি মধ্যযুগীয় পরিবেশ ফিরে আসার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

আমরা অনুমান করতে পারি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এমন একটি আন্দোলনের অনুপ্রেরণা, তাদের নিজ মস্তিষ্কে জারিত হয়নি বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সক্রিয় জৈববিবর্তনবিরোধী মৌলবাদী গোষ্ঠীর প্রচারণার প্রভাবই তাদের এই প্রণোদনার মূল উৎস। পরে জানা যায়, স্কুলের রসায়ন বিভাগের একজন শিক্ষক ছাত্রদের মূল প্ররোচক হিসেবে সক্রিয় ছিলেন। যে কারণেই হোক জৈববিবর্তনের তত্ত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে যে এক ধরনের দার্শনিক সংকট রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই সংকট বিজ্ঞানচর্চা এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অধ্যয়নের ক্ষেত্রে গুরুতর প্রতিবন্ধকতা কিনা সেটাও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

ঐ স্কুলের এক ধর্মবিশ্বাসী শিক্ষকের সাক্ষাৎকার থেকে ভিন্নমত পাওয়া গেল। তিনি জানালেন, যদিও পারিবারিকভাবে তিনি গোঁড়া ধর্মীয় পরিবেশ ও ধর্মবিশ্বাস নিয়ে বড় হয়েছেন, জৈববিবর্তনের তত্ত্ব অধ্যয়ন ও আত্মস্থ করতে তার কোনো সমস্যা হয়নি। তার মতে, জীবজগতের পর্যবেক্ষণের (observation) ভিত্তিতে গড়ে ওঠা

কোনো প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা ঈশ্বরের প্রতি 'বিশ্বাসকে টলাতে পারে না'। কারণ প্রাকৃতিক নিয়ম 'ঈশ্বরের সৃষ্টি'। অতএব প্রাকৃতিক নিয়মে জীবজগত সৃষ্টি হয়েছে এই ব্যাখ্যা তার বিশ্বাসের (faith) পরিপন্থী নয়। অর্থাৎ ঈশ্বরকে স্বীকার করলেও এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, প্রাকৃতিক নিয়মে জগত চলছে এ কথা বলতে বাধা নেই।

বিজ্ঞানে অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যার কোনো স্থান নেই। বাস্তব পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে গড়ে ওঠা মানবিক উপলব্ধিই বিজ্ঞান। উপরোল্লিখিত শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির এক ধরনের আপোস। এ ধরনের আপোস ছাড়া বিজ্ঞানকে অধ্যয়ন ও গ্রহণের ক্ষেত্রে স্থির বিশ্বাসীদের মধ্যে সংকটের সৃষ্টি হয়। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার বিরোধ ও সংঘর্ষ সেই সংকটেরই ইঙ্গিত দেয়।

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্ম, বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের সাথে আপোস করেছে এবং ধর্মের ব্যাখ্যার পরিবর্তন করে বিজ্ঞানের ঐ তত্ত্বকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসীদের দার্শনিক সংকটকে প্রশমিত করেছে। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা তৈরির এ কাজটি বিজ্ঞানের প্রতি নিবেদিত ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিরা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও যুক্তির প্রতি আগ্রহী ধর্মচিন্তাবিদরা এর সূচনা করেছেন। এইভাবে দেখা গেছে, অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই ধর্ম দ্বারা 'আত্মীকৃত' হয়েছে। কিন্তু জৈববিবর্তনের তত্ত্ব ধর্মবিশ্বাসীদের এক অংশের দ্বারা গৃহীত হলেও বহুলোক ধর্মীয় অবস্থান থেকে এর বিরোধিতায় এখনো তৎপর। এ অবস্থা থেকে যে প্রশ্নটি আমাদের সামনে চলে আসে তা হলো— জৈববিবর্তনের তত্ত্বের মধ্যে কি এমন কিছু রয়েছে যে কারণে এ বিষয়ে অস্পষ্টতা এবং বিতর্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ভৌত বিজ্ঞানের তুলনায় অনেক বেশি? কেন এতটা পথ আসার পরও জৈববিবর্তনের তত্ত্বের যথার্থতা নিয়ে মৌলিক কিছু প্রশ্ন উঠেছে? যেমন, জৈববিবর্তনের তত্ত্ব কি প্রকৃত বিজ্ঞান? বিজ্ঞানের অন্যান্য অনেক শাখার মতো জৈববিবর্তনের তত্ত্বের ভিত্তিতে কি ভবিষ্যতে কি ঘটবে (prediction) সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়? জীববিজ্ঞানকে কি পদার্থ বিজ্ঞানের পর্যায়ে নামিয়ে আনা উচিৎ? বিজ্ঞানকে কি প্রাকৃতিকই হতে হবে? জৈববিবর্তনের তত্ত্বের প্রস্তাবনাগুলোকে কি যাচাই (falsify) করা বা পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব? যদি না হয় তাহলে কি এই তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক বলা যায়? জৈববিবর্তনের তত্ত্বকে গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সংকট রয়েছে তার পেছনে রয়েছে এই সব পদ্ধতিগত এবং দার্শনিক প্রশ্নসমূহ।

২.

বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞান (Evolutionary Biology) জীববিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা, যা জীবজগত এবং প্রাকৃতিক ইতিহাসকে (natural history) পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের প্রধান ভিত্তি। কিন্তু একটা বিষয় খুব আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করি যে, বিজ্ঞানের এই শাখার গবেষণালব্ধ তথ্য, উপাত্ত ও সিদ্ধান্তকে বর্জন করার একটি প্রবল স্রোত পৃথিবীর সবদেশেই রয়েছে। এই স্রোত এত শক্তিশালী যে, এদের প্রচারণা ও সক্রিয় তৎপরতার কারণে পৃথিবীব্যাপী অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন অধিকাংশ মানুষের মধ্যে এমন ধারণা ছড়িয়ে গেছে যে, জৈববিবর্তন কল্পিত একটি

ব্যাপার এবং বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞান কোনো 'বিজ্ঞান নয়'। 'কোনো গবেষণা বা প্রমাণের ভিত্তিতে দাঁড়ায়নি এই মতবাদ', তাই বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা 'বহু আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে' এই তত্ত্ব। আবার অনেকে একে কিছু লোকের 'অন্ধবিশ্বাস' বলেও প্রচার করে থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞান বিজ্ঞানের অনেকগুলো শাখার সংশ্লেষ বা Synthesis। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রধান অংশ এসেছে জীববিজ্ঞান থেকে। কিন্তু বিজ্ঞানের অন্যান্য যেসব শাখার অবদান এর সাথে অবিচ্ছেদ্য তার মধ্যে প্রকৃতিবিজ্ঞান থেকে রয়েছে বিশুদ্ধ পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন, মহাকাশ বিদ্যা ও ভূতত্ত্ব; অন্যদিকে মানবিক বিজ্ঞানের মধ্যে রয়েছে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব ও প্রাক-ইতিহাসতত্ত্ব (Prehistory), মনস্তত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব। বিবর্তনের তত্ত্বকে বাতিল করে দিলে পক্ষান্তরে বিজ্ঞানের উপরোক্ত শাখাগুলোর দিকেই প্রশ্ন তোলা হয়। এরকম একটি প্রচেষ্টার মধ্যে যৌক্তিকতার চেয়ে হঠকারিতা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদনার সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনাই বেশি। এ ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি যৌক্তিক মানুষের সামনে বড় হয়ে দেখা দেয় সেটি হচ্ছে— কেন এত ব্যাপক সংখ্যক মানুষ বিজ্ঞানের একটি শাখার বিরোধিতা করছে (কখনো তাদের মতো যুক্তি দিয়ে, কখনো অযৌক্তিক ভাবেই?)।

এই বিরোধিতার প্রধান কারণ হলো জৈববিবর্তনের তত্ত্বকে দার্শনিকভাবে মেনে নিতে না পারা। জৈববিবর্তন তত্ত্বের খুঁটিনাটি নিয়ে এসব বিরোধিতাকারীদের কোনো মাথাব্যথা নেই। এই তত্ত্ব দার্শনিকভাবে এমন একটি সত্যকে (fact) সামনে নিয়ে এসেছে যে তা জগত সম্পর্কে মানুষের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিকে পাল্টে দিতে উদ্যত হয়েছে। তাদের আপত্তির জায়গাটি সেখানেই। মানুষের ইতিহাসে আমরা দেখেছি, যখনই কোনো নতুন চিন্তা প্রচলিত পুরানো চিন্তার বিরোধিতা করেছে, তখনই পুরানো চিন্তার মানুষদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে। একসময় বলপ্রয়োগে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতাকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, বিজ্ঞানকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। কিন্তু এ যুগে বিজ্ঞান এতটাই প্রতিষ্ঠিত যে বিজ্ঞানকে অগ্রাহ্য করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কোনো নতুন চিন্তাকে আক্রমণ ও বর্জন করার উপায় হলো একে 'বিজ্ঞানসম্মত নয়' বলে প্রতীয়মান করা।

জৈববিবর্তন যে নতুন দার্শনিক প্রস্তাবনা নিয়ে এসেছে সেটি হলো জীব ও জৈব প্রপঞ্চের মধ্যে কোনো রহস্যময়তা ও অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপার নেই। এই ক্ষেত্রেও বস্তুগত বা প্রাকৃতিক ব্যাখ্যাই যথেষ্ট। একটু পেছন থেকে এলে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হবে। প্রকৃতি ও জগত সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যখন সীমিত ছিল তখন দার্শনিকেরা জগতকে 'রহস্যময়' বলে ব্যাখ্যা করতেন। বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রসারের ফলে জগতকে দেখার সেই দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যেতে থাকে। বর্তমানে তাই জগতকে জানবার ও ব্যাখ্যা করার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ যে পদ্ধতি অনুসরণ করেন তা হলো— যৌক্তিক, বোধগম্য এবং রহস্যময়তামুক্ত নিয়মনীতি ও সূত্রের মাধ্যমে কোনো ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এই পদ্ধতি হঠাৎ করে আসেনি।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে দেকার্তে (Decartes) এবং নিউটন দেখিয়ে ছিলেন প্রাকৃতিক কারণসমূহ ভৌত প্রপঞ্চের ব্যাখ্যা হিসেবে যথেষ্ট। দেকার্তে এক যান্ত্রিক

বিশ্বের কথা বলেন, যেখানে প্রকৃতি জগতের প্রতিটি ঘটনাই পরস্পর কার্যকারণ দ্বারা সম্পর্কিত। অর্থাৎ প্রতিটি ঘটনারই প্রাকৃতিক কারণ রয়েছে। নিউটনের মহাকর্ষ, বল ও গতির সূত্রের যে সার্বজনীনতা তাতে একটা ব্যাপার প্রতিষ্ঠিত হয় যে ভৌত জগতের সব ঘটনাই প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী ঘটে। জগতের প্রতিটি ঘটনা যদি প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী ঘটে তাহলে যৌক্তিকভাবে বলা যায় অতিপ্রাকৃত (super natural) কোনো ঘটনা ঘটতে পারে না। দেকার্তে ও নিউটন উভয়েই ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন, এই মতবাদের ফলে যৌক্তিকভাবেই তাদের ঈশ্বর পরিণত হলেন দূরবর্তী 'আদি কারণে'। চলমান প্রাকৃতিক ঘটনার ক্ষেত্রে কোনো অতিপ্রাকৃত হস্তক্ষেপ নেই, এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলো।

'প্রকৃতির বাইরে কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না'— এ ধারণা তখন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের দ্বারা গৃহীত হচ্ছিল। প্রকৃতি সম্পর্কে এই উপলব্ধি, নীতিশাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্বের বিকল্প হিসেবে দাঁড়িয়েছিল।

অর্থাৎ এই পর্যায়ে এসে 'প্রকৃতি বিজ্ঞান ঈশ্বরকে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছে। জগতের শাসক ও পরিচালক হিসেবে তাঁর ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে। তিনি পরিণত হয়েছেন কেবল আদি কারণে কিংবা ভাসা ভাসা এক সাধারণ নিয়মে।'

উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত জৈব যৌগ এবং জৈব প্রপঞ্চসমূহের উৎপত্তি ও বিকাশের নিয়ম সম্পর্কে মানুষের স্পষ্ট ধারণা ছিল না। বিজ্ঞানের এসব ক্ষেত্রের ব্যাখ্যায় তখনো 'অতিপ্রাকৃত' ব্যাখ্যার অস্তিত্ব ছিল। জৈব পদার্থসমূহ যেমন চিনি, চর্বি, তেল প্রভৃতিকে বিশ্লেষণ করে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর রসায়নবিদগণ দেখলেন এদের গঠন অজৈব যৌগ থেকে ভিন্ন এবং অনেক বেশি জটিল। ঐ সময়ের রসায়নবিদরা অজৈব যৌগ থেকে জৈব যৌগ উৎপন্ন করতে পারেননি। তখন এ বিষয়ে তারা কিছুটা রহস্যময় একটি ব্যাখ্যা হাজির করেছিলেন। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিশেষ এক 'প্রাণশক্তি' (vital force) ছাড়া জৈব যৌগ তৈরি হতে পারে না। তাই তাদের ধারণা ছিল মানুষের পক্ষে অজৈব উপাদান থেকে জৈব যৌগ উৎপন্ন করা সম্ভব নয়। 'অতিপ্রাকৃত' কোনো শক্তির কাছ থেকে বা জীবের দেহ থেকে প্রাণশক্তি নিয়ে এসব যৌগ তৈরি হতে পারে। শুধু তাই নয়, সে সময়ের রসায়নবিদরা মনে করতেন, জৈব জগতের রাসায়নিক মূলনীতি (chemical laws) অজৈব জগতের রাসায়নিক নিয়মনীতি থেকে ভিন্ন। কিন্তু এই ভ্রান্ত ধারণা অচিরেই ভেঙে যায়। কারণ বিজ্ঞানীরা ধীরে ধীরে ল্যাবরেটরিতে অজৈব পদার্থ থেকে জৈব যৌগ তৈরি করতে সক্ষম হন। ১৮২৮ সালে জার্মান বিজ্ঞানী Wöhler অ্যামোনিয়াম সায়ানাইডকে উত্তপ্ত করে ইউরিয়া তৈরি করতে সক্ষম হন। এভাবে জৈব যৌগের তথা জৈব রসায়নের ক্ষেত্র থেকে রহস্যময় ও অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা অপসারিত হয়।

৩.

'শুধু বস্তুগত কারণ দিয়ে জৈবনিক ক্রিয়া, জীবের উৎপত্তি ও পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়'; উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদের এরকম ধারণাই ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে জৈববিবর্তনের মতবাদগুলো আলোর মুখে দেখছিল। ডারউইন

পূর্ববর্তী মতবাদগুলোতে বিবর্তনের যে প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো কোনো পরিপূর্ণ বস্তুগত ব্যাখ্যা ছিল না; এতে মনে হয়, কোনো 'রহস্যময় কারণে' বা 'অতিপ্রাকৃত শক্তির (বা ঈশ্বরের) পরিচালনায় ঘটনাগুলো ঘটছে। যেমন ল্যামার্কের বিবর্তনের তত্ত্বে দেখানো হয়েছে পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন (adaptation) বা খাপ খাওয়াতে গিয়ে জীব পরিবর্তিত হয়ে অন্য একটি জীবে পরিণত হচ্ছে। কোনো একটি ভূতাত্ত্বিককালে ঘাস ও ছোট গাছের অভাব ঘটেছিল বলে খাট গলার একটি প্রাণী উঁচু গাছে তার খাবার খুঁজতে লাগলো। তখন ধীরে ধীরে তার গলা লম্বা হয়ে সে জিরাফে পরিণত হলো। এখানে প্রাণীটি অভিযোজন করতে চাইলো এবং সেদিকে তার শারীরিক পরিবর্তন হয়ে গেল! এবং তা পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিতও হতে থাকলো! কিভাবে? কে তাকে এমন পরিবর্তনের দিকে নিয়ে গেল যা অভিযোজনের জন্য প্রয়োজন? এ প্রশ্নটা থেকেই যায়। এরকম যদি ঘটেও থাকে তার পক্ষে বস্তুগত ব্যাখ্যা দেয়া মুশকিল। অর্থাৎ ল্যামার্কের মতবাদের অনুসিদ্ধান্তে অতিপ্রাকৃত কোনো ব্যাখ্যা চলে আসাও বিচিত্র কিছু নয়।

পক্ষান্তরে ডারউইন দেখালেন, পরিবর্তন জীবজগত তথা সমগ্র বিশ্বের সাধারণ নিয়ম। বিভিন্ন কারণে একটি প্রজাতির বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে যথেচ্ছ (random) পরিবর্তন হতে থাকে। (কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে এ পরিবর্তন হয় না। বেশির ভাগ এ ধরনের পরিবর্তনই অভিযোজিত হবার মতো নয়।) এই সব পরিবর্তনের মধ্যে যেটি ঐ সময়ে প্রকৃতিতে টিকে থাকার জন্য উপযোগী সেটিই টিকে থাকবে, অন্যগুলি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ অনেক যথেচ্ছ পরিবর্তনের মধ্যে যেটি অভিযোজিত হবার মতো সেটি টিকে গেল। উপরের উদাহরণ অনুযায়ী ডারউইনদের তত্ত্বকে বর্ণনা করলে দাঁড়ায়, ছোট গলার প্রাণীদের মধ্যে বহু ধরনের পরিবর্তন হলো। কিন্তু যার গলা লম্বা হলো সে ছাড়া অন্য সবাই বিলুপ্ত হয়ে গেল। এভাবে যে পরিবর্তন ঘটলো তা কারো সচেতন উদ্দেশ্য ও পরিচালনা ছাড়াই ঘটতে পারে। অর্থাৎ এটি জীবের পরিবর্তনের পরিপূর্ণভাবে বস্তুগত একটি ব্যাখ্যা। জৈবনিক ঘটনাগুলো কেন ঘটে, এই প্রশ্নের জবাবে ডারউইনের বিবর্তনের তত্ত্ব অনুযায়ী এখনা বলা যাবে— 'প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী ঘটে। কারণ জৈবনিক বৈশিষ্ট্যগুলো কোনো সচেতন স্রষ্টা ছাড়াই কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে সেটাই দেখিয়েছেন ডারউইন। এর নির্দশন হিসেবে উপস্থিত করেছেন পৃথিবীব্যাপী অসংখ্য জীবন্ত প্রজাতি এবং অস্তিত্বমান ও বিলুপ্ত প্রাণীর অসংখ্য ফসিল, তাদের ভৌগোলিক বিন্যাস এবং অন্যান্য প্রবণতা। অর্থাৎ ডারউইন যখন বলতে চাইলেন জীবজগতের সবগুলি ঘটনাই প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী ঘটে, এখানে রহস্যময়তা বা অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই— তখনই বেধে গেল মহাগণ্ডগোল।

এতদিন জৈব প্রপঞ্চ ও জীব সৃষ্টির বস্তুগত ব্যাখ্যা না থাকায় ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃত শক্তির মাধ্যমে এগুলোর সৃষ্টি ও পরিচালনা হয় বলে ব্যাখ্যা দেয়া হতো ডারউইনের মতবাদ সেই ব্যাখ্যার ওপর বড় এক আঘাত হানে। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মানুষ ও 'ইতর প্রাণী' এক পর্যায়ভুক্ত নয়। সে ধারণাও আঘাতপ্রাপ্ত হয়। অনেকে প্রশ্ন তোলেন তবে কি এই মতবাদ ধর্মকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে? ধর্মের সাথে বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞানের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু যেহেতু এটি জীবজগত সম্পর্কে

বস্তুগত ব্যাখ্যাকে উপস্থিত করে, পূর্বনির্ধারিত (pre-conceived) কোনো ধারণা নিয়ে এ বিষয়কে অধ্যয়ন করা যাবে না।

অর্থাৎ প্রাকৃতিক ইতিহাস (natural history) জীবজগত এবং জৈব প্রপঞ্চকে বস্তুগত কারণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব— এই দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া জৈববিবর্তনবাদের অধ্যয়ন সম্ভব নয়। আমরা লক্ষ্য করি বর্তমান সময়েও ভৌত প্রপঞ্চের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সাধারণ মানুষের কাছে যতটা গ্রহণযোগ্য হয়েছে জৈব প্রপঞ্চের ক্ষেত্রে ততটা হয়নি। এর কারণ দু'টি— প্রথম কারণ পূর্বনির্ধারিত (সামাজিক ও ধর্মীয়) ধারণার প্রভাব। জগত সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি গভীরভাবে প্রভাবিত হয় আমরা যে সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে উঠি তার দ্বারা। প্রকৃতিতে সংঘটিত ঘটনাগুলোকে আমরা কিভাবে দেখছি বা ব্যাখ্যা করছি তা নির্ভর করে আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। প্রচলিত ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবের কারণে জীবের উৎপত্তি ও জৈবনিক ক্রিয়াসমূহের বস্তুগত ব্যাখ্যাকে অনেকে গ্রহণ করা দূরে থাক, অধ্যয়ন করতেই চান না এবং অন্যকেও এর থেকে বিরত রাখতে চান। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, জৈব প্রপঞ্চের জটিলতা ও দুর্বোধ্যতা। কোনো জটিল বিষয়ের মধ্যে সবকিছু সহজবোধ্য থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। কোনো কিছুকে বুঝতে না পারলে তাকে রহস্যময়তা বা 'অতিপ্রাকৃত শক্তি' দিয়ে ব্যাখ্যা করা মানুষের এক প্রাচীন প্রবণতা। দুর্বোধ্য বিষয়কে এভাবে ব্যাখ্যা করে আপাতত মনকে প্রবোধ দেয়া যায় কিন্তু তাতে বোধগম্যতার ক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি ঘটে না। বরং ঐ বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতাই প্রকাশিত হয়। কোনো প্রপঞ্চ বা বিষয়কে পরিপূর্ণভাবে বুঝবার মতো যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য ও প্রমাণ উপস্থিত না থাকলে, যেসব তথ্য ও প্রমাণ আছে তার ভিত্তিতে যৌক্তিকভাবে যে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় সেটাই, সে বিষয়ে ঐ সময়ের বৈজ্ঞানিক ধারণা। যদিও সেখানে সংশয় থাকতে পারে এবং বিকল্প ব্যাখ্যাও থাকতে পারে। সংশয় বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নতুন গবেষণা অনেক নতুন তথ্যের জন্ম দেয়, তাতে অনেক পুরানো সংশয় কেটে স্পষ্ট সিদ্ধান্তের জন্ম নেয়। নতুন তথ্যের জোয়ারে পূর্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত, পরিশীলিত এমন কি পরিত্যক্ত হতে পারে তবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিবর্তন, পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতেই হতে হবে, মনগড়া ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নয়

জৈববিবর্তন তত্ত্বের পদ্ধতিগত সমস্যা

জৈববিবর্তনের তত্ত্বকে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আছে। জৈববিবর্তনসহ বিজ্ঞানের আর কিছু শাখা যেমন ভূতত্ত্ব (Geology), জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy) প্রভৃতির সাথে ভৌত বিজ্ঞানসমূহের একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। প্রথমোক্ত বিজ্ঞানসমূহকে বলা হয় 'ইতিহাস নির্ভর' বিজ্ঞান (Historical Science)। এ ধরনের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক প্রকল্প বা hypothesisকে পরিপূর্ণভাবে যাচাই করা যায় না। দার্শনিক কার্ল পপারের মত অনুযায়ী যে হাইপোথিসিসকে যাচাই (তার ভাষায় "falsify") করা যায় না তা বিজ্ঞানসম্মত নয়। যেমন, যদি আমরা বলি দৃশ্যমান নয় এমন ফেরেশতা বা দেবদূত আমাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী। এই হাইপোথিসিস কোনো পর্যবেক্ষণের (observation) ভিত্তিতে গৃহীত হয়নি এবং কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার

দ্বারা যাচাইও করা সম্ভব নয়। কিংবা কেউ যদি বলেন— 'গ্রহ, নক্ষত্র এবং গ্যালাক্সিসমূহের 'মহাকর্ষীয় গতি অতিপ্রাকৃত শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত' এ বিষয়টিকেও যাচাই করা সম্ভব নয়। জৈববিবর্তনসহ অন্যান্য ইতিহাস নির্ভর বিজ্ঞানের মূল বিষয় হলো অতীতের ঘটনা। এ সকল ক্ষেত্রের hypothesis-এর যথার্থতা প্রমাণের জন্য অতীতের অনেক অজানা ঘটনাকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। অতএব, অনেকে অভিযোগ করেন যে, যেহেতু অতীতের ঘটনাকে যাচাই করা কঠিন অতএব এসব হাইপোথিসিসকে বিজ্ঞানসম্মত বলা যায় না।

এ ধরনের অভিযোগ সত্ত্বেও বহুসংখ্যক বিজ্ঞানী ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা বা বিবর্তন বিষয়ে অসংখ্য হাইপোথিসিসের ওপর কাজ করে চলেছেন অর্থাৎ এসব বিষয়ে তাদের অনুসন্ধান ও গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন। এর মূল কারণ হচ্ছে কৌতূহল এবং অতীতকে জানার প্রয়োজনীয়তা। এক্ষেত্রে যে পদ্ধতিগত সংকট রয়েছে তার সমাধান বিজ্ঞানীরা করেছেন অন্যভাবে। অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেভাবে আমরা একটা ঘটনাকে ব্যাখ্যা করি, ঐতিহাসিক বা অতীতের একটি ঘটনাকেও আমরা একই পদ্ধতিতে যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি যদি তা পর্যবেক্ষণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। যেমন হোমিনিড (Hominid— বানর, এপ এবং মানুষ) প্রাণীদের প্রাপ্ত প্রাইমেটসদৃশ ফসিলসমূহ এবং বর্তমানের জীবন্ত প্রাণীদের ধারাকে পর্যবেক্ষণ করলে ধারণা করা যায় যে প্রাইমেট জাতীয় প্রাণী থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। একইভাবে রক্তের হিমোগ্লোবিন নামক প্রোটিন এবং মাংসপেশীর মায়োগ্লোবিন নামক প্রোটিনে অ্যামাইনো এসিডসমূহের ক্রমবিন্যাসের (sequence) মিল দেখে ধারণা করা যায় একই উৎস থেকে তারা বিবর্তিত হয়েছে। এই দু'টি হাইপোথিসিসে ঘটনা দু'টি অতীতের হলেও এ ঘটনা দু'টি যাচাইযোগ্য (refutable) নয় তা কিন্তু বলা যাবে না। কারণ যদি হোমিনিডদের কোনো ঘোড়াসদৃশ বা পাখিসদৃশ পূর্বপুরুষের ফসিল আবিষ্কৃত হয় যেমন ছিল গ্রিক পুরাণের সেন্টর (Centaurs) ও গারগইল (Gargoyles), তাহলে হাইপোথিসিসটি ভুল প্রমাণিত হবে। তেমনি মাইয়োগ্লোবিন ও হিমোগ্লোবিনের অ্যামাইনো এসিড ক্রমবিন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ অমিল পাওয়া গেলে উপরোক্ত হাইপোথিসিসটি ভুল প্রমাণ করা সম্ভব। ইতিহাসের কোনো একটি পর্বে, পৃথিবীর কোনো একটি অংশে সুনির্দিষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, বর্তমানে পরীক্ষাগারে বা অন্য কোথাও তার পুনরাবৃত্তি ঘটানো সম্ভব না হলেও উক্ত হাইপোথিসিসগুলো যাচাইয়ের অযোগ্য নয় অতএব এর বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব রয়েছে।

ডারউইন বলেছিলেন, দুটো বিষয় তার তত্ত্বকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে পারে। প্রথমত যদি বিবর্তনের পরম্পরার মধ্যে অসঙ্গতি দেখা যায়। যেমন প্রাইমেট জাতীয় প্রাণী থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। যদি মানুষের এমন একটি ফসিল পাওয়া যায় বিচরণকাল প্রাইমেটদের উৎপত্তিকালের বহু আগে, তাহলে ঐ ধারণাকে আর সত্য বলে মানা যায় না। দ্বিতীয়ত, যদি দু'টি ভিন্ন ভৌগোলিক এলাকায় (Biogeographic region) একই প্রজাতির অস্তিত্ব পাওয়া যায় (যখন পরবর্তীতে তাদের অভিগমন ঘটেনি)। জীবসমূহ ঈশ্বর সৃষ্টি হলে সব এলাকায় সমানভাবে (অন্তত যেসব এলাকা তাদের বাসের জন্য উপযোগী) তাদের উপস্থিত থাকার কথা। কিন্তু

ডারউইন তার বিশ্ব ভ্রমণে লক্ষ্য করেন প্রতিটি জীব একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বিবর্তিত হয়। এটি বিবর্তনের অন্যতম একটি প্রমাণ। অর্থাৎ জৈববিবর্তনের তথ্য ও সিদ্ধান্তসমূহ যাচাই ও খণ্ডনের অযোগ্য নয়। ডারউইন উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও এ তত্ত্বের আরো অনেকগুলো দিক রয়েছে যেসব ক্ষেত্রে অসঙ্গতি এই তত্ত্বকে খণ্ডন করতে পারে। তবে ডারউইনের সময় থেকে বিবর্তনের তত্ত্বকে খণ্ডন করার মতো উল্লেখযোগ্য কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। গত দেড়শ' বছরে জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে উন্নতি ঘটেছে তা জৈব বিবর্তনের তত্ত্বকে আরো বস্তুনিষ্ঠ, বোধগম্য ও পূর্ণাঙ্গ করেছে।

ইতিহাস নির্ভর বিজ্ঞানসমূহের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হলো— এক্ষেত্রে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নের মতো প্রথমেই একটি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয় না। বরং একটি নির্দিষ্ট ঘটনা বা বিষয়কে বোঝার ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। যেমন, সৌরজগত কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে এ প্রশ্নটি নিয়ে যখন আলোচনা করা হয় তখন এক্ষেত্রের জন্য সুনির্দিষ্ট অনেক বিষয়ের অবতারণা করা হয়, যা সকল নক্ষত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ আমেরিকা কিভাবে পৃথক হয়েছে, এ প্রশ্নটি আলোচনার ক্ষেত্রে, ভূতত্ত্বেও সকল মহাদেশের পৃথকীকরণের সাধারণ নিয়মের আলোচনা প্রাধান্য পায় না। তেমনি মানুষের উৎপত্তির আলোচনা করতে গিয়ে জৈববিবর্তনবাদেও সকল প্রজাতির পরিবর্তনের সাধারণ নিয়ম আলোচিত হয় না। অর্থাৎ যদিও ইতিহাস নির্ভর বিজ্ঞানসমূহ তাদের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মসমূহকে ব্যবহার করে, যেমন বলের সূত্র, রাসায়নিক বিক্রিয়া, মহাকর্ষ ইত্যাদি কিন্তু সকল প্রপঞ্চে ক্রিয়াশীল সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা এসব বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য নয়, এর মূল্য লক্ষ্য হলো একটি জটিল প্রপঞ্চকে বোধগম্য করার জন্য তাকে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা।

একটি সহজ উদাহরণ দিচ্ছি— হাইড্রোজেন পরমাণুর বিভিন্ন অবস্থার ধর্ম (property) একটি সাধারণ (general) ভৌত নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু বিভিন্ন প্রাণীর সংগঠন তাদের জৈবনিক ক্রিয়া কিংবা তাদের শরীরের অঙ্গসংস্থান ইত্যাদিকে ব্যাখ্যা করা যায় কেবল ঐ নির্দিষ্ট প্রাণীর জৈবিক ইতিহাসের ভিত্তিতে। ভৌত ও জৈব প্রপঞ্চে বিষয়সমূহ একভাবে বিবেচিত হয় না। যেমন 'ভরমাত্রা' কথাটির অর্থ সকল ভৌত প্রপঞ্চে একই। কিন্তু জৈব প্রপঞ্চের ক্ষেত্রে বিষয়গুলি সবসময় এরকম নয়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো টিকে থাকার যোগ্যতা (fitness)। যদিও এক ধরনের মাপকাঠিতেই একে বিচার করা হয়, প্রত্যেক প্রজাতির ক্ষেত্রে এটি গুণগতভাবে ভিন্ন প্রকৃতির। কোনো একটি প্রজাতির প্রতিবেশ (habitat)-এ দেখা গেল প্রচুর খাদ্য রয়েছে, যা সে সহজেই গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু সেখানে তার অনেক সংহারকারী (Predator) রয়েছে, যারা তার অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। অতএব, এক্ষেত্রে সংহারকারীদের কাছ থেকে বাঁচার জন্য তার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেটাই তার টিকে থাকার যোগ্যতার প্রধান দিক। অন্য একটি প্রজাতির ক্ষেত্রে দেখা গেল, তার উল্লেখযোগ্য কোনো সংহারকারী নেই। কিন্তু তার habitat-এ খাবারের বা শিকারের ঘাটতি আছে। এক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্য তাকে খাদ্য

সংগ্রহ বা শিকার করার কুশলতা দেয় সেটিই তার টিকে থাকার যোগ্যতার প্রধান দিক। এক ধরনের প্রজাপতির ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, পাতার মতো সবুজ পাখার রঙ তার টিকে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ফলে সে তার সংহারকারীদের 'চোখে পড়ে না' অন্যদিকে আরেক ধরনের প্রজাপতি যার প্রতিবেশে উল্লেখযোগ্য সংহারকারী নেই, সেখানে পাখার রঙ টিকে থাকার ক্ষেত্রে কোনো সুবিধা দিতে পারে না। প্রজাপতির ক্ষেত্রে সবুজ রঙ যে সুবিধা দিচ্ছে গাছের ক্ষেত্রে পাতার সবুজ রঙ ভিন্ন ধরনের সুবিধা দিচ্ছে অর্থাৎ জীববিজ্ঞানে একই ভৌত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব সকল প্রজাতির ক্ষেত্রে সাধারণীকৃত করা যাচ্ছে না।

অতীতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে যখন বিভিন্ন প্রাণী বিবর্তনের জন্য উপযোগী একই ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হয়। তাদের ক্ষেত্রে অতীতের মতোই কোনো পরিবর্তন ঘটতে পারে এমন বৈজ্ঞানিক অনুমান করা যায়। যেমন অন্ধকার গুহার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয় সকল প্রাণীদের চামড়ার রঞ্জক কমে যায়, চোখ হয়ে যায় লুপ্তপ্রায় (rudimentary)। রাসায়নিক পদার্থের প্রতি সংবেদনশীল অঙ্গসমূহের উন্নতি হয়। অন্যদিকে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পরিবেশে অভিযোজিত প্রাণীদের চামড়ার নিচে পুরু চর্বির স্তর থাকে। অনেক প্রাণীর রোমশতা বেড়ে যায়, কান ছোট হয়ে যায় ইত্যাদি। অতএব, নতুন করে কোনো প্রাণী যদি ঐ পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয় তাদের ক্ষেত্রেও ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত হবে তা বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি। অর্থাৎ বিজ্ঞানের এই শাখাও কিছু সাধারণ নিয়মের ভিত্তিতে পুনরাবৃত্তির ফলাফল বলে দিতে পারে।

জীবের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞান ভৌত বিজ্ঞানের থেকে একটু ভিন্ন পথে এগিয়ে যায়। যেসব প্রশ্ন এখানে উপস্থাপন করা হয় তা হলো 'কি ঘটেছিল', 'কিভাবে ঘটেছিল' এবং 'কেন এভাবে ঘটলো?' এরপর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এসব প্রশ্নের যৌক্তিক ব্যাখ্যা খুঁজে বের করার মধ্য দিয়েই সমৃদ্ধ হতে পারে এ সংক্রান্ত মানবীয় উপলব্ধি।

জৈব প্রপঞ্চ ভৌত প্রপঞ্চের চেয়ে জটিলতর হলেও, জীববিজ্ঞানের উন্নতির একপর্যায়ে আমরা জানতে পেরেছি যে, প্রতিটি জৈবনিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ভৌত নিয়মগুলিই (physical laws) ক্রিয়া করে। অতএব, ভৌত প্রপঞ্চগুলি যে প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে জৈব প্রপঞ্চও সেই একই নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে।

অর্থাৎ যেসব ধর্মবিশ্বাসীরা ভৌত বিজ্ঞানকে গ্রহণ করেছেন বা ভৌত বিজ্ঞানের নিয়মকানুনকে মেনে নেন তাদের পক্ষে জৈববিবর্তনকে মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে নতুন কোনো সমস্যা হবার কথা নয়। যেহেতু তাঁরা মনে করেন, ঈশ্বর আদি কারণ হিসেবে প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমে ভৌত প্রপঞ্চগুলি 'সৃষ্টি করেছেন' বা সূচনা করেছেন, তাহলে তাঁরই ধারাবাহিকতায় প্রাকৃতিক নিয়মেই সৃষ্টি হয়েছে জীবজগত, এ কথা যৌক্তিকভাবে বলা যায়। কারণ উভয় ক্ষেত্রে একই ভৌত নিয়ম ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ এই দার্শনিক প্রশ্নে নিউটনকে নিয়ে সমস্যা না হলে ডারউইন বা তার পরবর্তীকালের বিবর্তনবাদীদের নিয়েও সমস্যা হবার কথা নয়, যদি কারো এমন বিশ্বাস থাকে যে ঈশ্বর প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমেই জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

নিউটনের বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবনা হচ্ছে, সমগ্র বিশ্বজগতের সকল ভৌত প্রপঞ্চ প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে ও পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রস্তাবনা, বাইবেলের আদিপুস্তকের 'জেনেসিস' অংশে বা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে পৃথিবী সৃষ্টির যে বর্ণনা আছে তার সাথে অবশ্যই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাহলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐ ছাত্রছাত্রীরা যে কারণে জৈববিবর্তনের তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে চাচ্ছে না একই কারণে ভৌত বিজ্ঞানসমূহ পড়তেও তাদের অস্বীকৃতি জানানো উচিৎ। অর্থাৎ তারা যদি বলে 'জেনেসিসে'র সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন কিছু তারা পড়বে না তাহলে তাদের বিজ্ঞান পড়াই ছেড়ে দেয়া উচিৎ। বলাবাহুল্য ব্যাপারটা এত গভীরভাবে তারা ভাবেনি। ভাবেননি, যাঁরা তাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন সেই মৌলবাদী গোষ্ঠীও।

সপ্তদশ শতাব্দী বা তারপরও মৌলবাদী গোষ্ঠীর লোকেরা কেউই বোধ করি এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে ভেবে দেখেননি। যদি ভাবতেন তাহলে নিউটনের দশাও একপর্যায়ে ডারউইনের মতো হবার কথা। নানা ঐতিহাসিক কারণে নিউটনের তত্ত্ব গ্যালিলিও বা ডারউইনের তত্ত্বের মতো গুরুতর কোনো আক্রমণের শিকার হয়নি। এর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো— সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের রয়েল সোসাইটি যখন গোঁড়া ধার্মিকদের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল, নিউটন এবং রবার্ট বয়েল তখন সাধারণ মানুষকে এই বলে সান্ত্বনা দেন যে— 'ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো মৌলিক বিরোধ নেই।'

ধর্মের পক্ষ থেকে বিবর্তনবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে অনেকে নিউটনের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। *'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব'* নামক বইয়ে মৌলানা মো. আব্দুর রহীম বিবর্তনবাদের অসারতা প্রমাণ করার জন্য নিউটনকে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ নিউটন সৃষ্টিকর্তা' বিশ্বাস করতেন বলে ধর্মের পক্ষে তাকে দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু তিনি হয়তো জানেন না নিউটনের বিশ্বাস যাই হোক "...নিউটনীয় পদার্থ বিজ্ঞান ধীরে ধীরে ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিতে থাকে। ...এক নৈর্ব্যক্তিক ও দূরবর্তী ঈশ্বরকে উন্মোচিত করে...যিনি কেবল জগতের আদি কারণ " এই ঈশ্বর ধর্মগ্রন্থের কথিত সৃষ্টিকর্তার মতো নন। তবে ধর্মের ব্যাখ্যারও পরিবর্তন ঘটছে। তাই নিউটনের পদার্থ বিজ্ঞান ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এনেছে তাকে গ্রহণ করার মাধ্যমে ধর্ম নিউটনীয় পদার্থ বিজ্ঞানকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে অনেকে জৈববিবর্তনকে 'ধর্মীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য' বলে ভাবছেন। জৈববিবর্তন সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে তাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা এই গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে সহায়তা করেছে। যেমন, "জৈববিবর্তনের প্রস্তাবনা কি ধর্মের বিরোধী নয়?"— এই প্রশ্নের জবাবে তারা বলছেন— 'জৈববিবর্তন আক্ষরিক অর্থে 'জেনেসিস'-এর প্রথম অধ্যায়ের বিরোধী হলেও ধর্মের বিরোধী নয়। কারণ জেনেসিসের ঐ অধ্যায়ের যে ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে সে অনুযায়ী ঈশ্বর ছয় দিনে নয়, বহু কোটি বছর ধরে প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারাই জগৎ ও জীব সৃষ্টি করেছেন।' অর্থাৎ ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির আদিকারণ হলেও ভৌত জগতের মতো জীবজগতেও বস্তুগত ব্যাখ্যা ধর্মের দ্বারা গৃহীত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের একটি শাখার প্রতি ধর্মবিশ্বাসী মানুষকে আক্রমণাত্মক করে তোলার মৌলবাদী প্রচেষ্টা হয়তো অনেকটাই কমে যাবে।

প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষ যতটুকু জানতে ও বুঝতে পেরেছে তার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বিজ্ঞান। তাই বিজ্ঞান কাল্পনিক এবং অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করে না। অন্যদিকে প্রকৃতির অজানা ও অবোধগম্য অংশের কল্পনাশ্রিত ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয় ধর্ম। তাই ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব অনিবার্য। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্মের দ্বারা বৈজ্ঞানিক মতবাদ এবং বিজ্ঞানীদের আক্রান্ত হবার ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু বিশ ও একুশ শতাব্দীর বাস্তবতা একটু ভিন্ন। বিজ্ঞান এ যুগে মানুষের জৈবিক ও চিন্তাকে এত ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে যে ধর্মকেও নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বিজ্ঞানের সাথে আপোস করতে হচ্ছে। ধর্মও চেষ্টা করছে 'বিজ্ঞানসম্মত' হয়ে ওঠার। অতএব, এ যুগে ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী বলে বিজ্ঞানের কোনো শাখার শিক্ষা ও গবেষণাকে আটকানো যাবে না। এ যুগের শিক্ষার্থীরা সুস্থ মাথায় চিন্তা করলে, কোনো কিছুর বিনিময়েই বিজ্ঞান-শিক্ষা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইবে না।

বিজ্ঞানের মূল পদ্ধতি মুক্তচিন্তা ও চিন্তার গতিশীলতার পক্ষে। যাঁরা চিন্তার গতিশীলতার বিরোধী এবং রক্ষণশীল তারাই মত ও শিক্ষার অবাধ প্রবাহকে ভয় পান এবং বাধাগ্রস্ত করতে চান। মৌলবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক বিজ্ঞানের একটি শাখার শিক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করার উদ্দেশ্য তাই আমাদের কাছে অস্পষ্ট নয়। ধর্মবিশ্বাসী উদারনৈতিক মানুষেরা একসময় ভৌত বিজ্ঞানের সাথে আপোস করে একে বিজ্ঞানের সাথে মিলিয়ে নিয়েছে। একইভাবে, জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রগুলোর সাথেও ধর্মকে মেলানো শুরু হয়েছে, না মিলিয়ে উপায় নেই।

বিজ্ঞানের মূল কাজ হলো প্রকৃতি ও জগৎ সম্পর্কে মানুষের বোধকে বাড়িয়ে তোলা। ডারউইনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞানের (Evolutionary Biology) ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে তার ফলে জীবজগৎ, প্রাকৃতিক ইতিহাস এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কে মানুষের বোধ অনেকটা এগিয়ে গেছে। অতএব, যতদিন জগৎ সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল এবং জ্ঞানপিপাসা থাকবে, জৈববিবর্তনের তত্ত্বপাঠ করার জন্য যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রস্তুত হতে হবে তাকে।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

০১. Jullian Huxley: *Evolution in Action*; CHATTO & WINDUS, London, 1953.

০২. I.Michael Lerner: *Heredity, Evolution and Society*, Berkeley and Stamford, 1968.

০৩. *চার্লস ডারউইনের আত্মচরিত* (আনোয়ারুল হক অনূদিত), প্রথম সংস্করণ,১৯৮৯, নওরোজ কিতাবিস্তান,ঢাকা।

০৪. দ্বিজেন শর্মা : *সতীর্থবলয়ে ডারউইন*, সাহিত্য সমবায়, ঢাকা,১৯৭৪।

০৫. মুহাম্মদ আঃ রহিম : *'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব'*,ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র,ঢাকা, ১৯৮২।

০৬. জে ব্রনোওস্কি : *বিজ্ঞানের চেতনা (The Common Sense of Science)*. জহুরুল হক অনুদিত, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাক, ১৯৯৩।

০৭. Strick Berger M.W, *Evolution (Third Edition)*, Jones and Bartlett Publisher, USA, 2000.

০৮. Fisher, R.A,1958, *The Genetical Theory of Natural Selection*, 2nd edition, Dover, NewYork.

০৯. Culner D.C,1982, *Came Life: Evolution and Ecology*, Harvard University Press, Cambridge, M.A.

১০. A.E.E. Mcenzie: *'The Major Achievements of Science', Vol 1*, Pakistan Branch, Chambrige University Press, Lahore, 1961.

১১. Waren Kart Von Roeschlaub: *'God and Evolution'*: www.talk.Origins Archive, 1994-1998.

১২. Eric C. R. Reeve: *'Encyclopedia ofGenetics'* : Pentagon Press, New Delhi, 2000.

১৩. Earl D.Hanson: *'Animal Diversity'*, Foundation of Modern Biology Series, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliff, New Jersey, USA.

১৪. *'Encyclopedia of Evolution'*,USA.

১৫. চার্লস ডারউইন: *ডিসেন্ট অব ম্যান*, ভাষান্তর, অসীম চট্টোপাধ্যায়, দীপায়ন, কলিকাতা, ভদ্র ১৪০৫।